রত্নহার।

[রায় মহাশয়, কর্ত্তৃঠাকুরাণী, সমস্যা ও অলঙ্কার সমন্বিত।]

স্বাধীনতার ইতিহাস, শিখ-ইতিহাস, বাদশা-নামা, সাধ[illegible]

প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-যন্ত্রে

শ্রী নটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

মুখবন্ধ।

"অনুসন্ধান"-পত্র সম্পাদন সময়ে, প্রায় আঠার বৎসর কাল, "অনুসন্ধানে", 'মাসিক উপন্যাসে' এবং বিবিধ আকারে, আমার সেই গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি লিখিতে হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশেই আমার নাম স্বাক্ষর ছিল না; কোন কোনটী আবার নামান্তরেও প্রকাশ করিয়াছিলাম; ক্বচিৎ দুই-চারিটীতে আমার নাম প্রকাশ পাইয়াছিল।

সময়ে সেই সকল গল্প ও উপন্যাসাদি পুস্তকাকারে প্রকাশের বাসনা থাকিলেও, ঘটনাচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তন তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি 'বঙ্গবাসীর' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় উদ্যোগী হওয়ায়, তাঁহারই ব্যয়ে, আপাততঃ "রত্নহারে" চারিটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হইল। 'রত্নহার' যদি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়, অন্যান্য গুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশে উৎসাহিত হইব। কিমধিকমিতি, তারিখ ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল।

নিবেদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
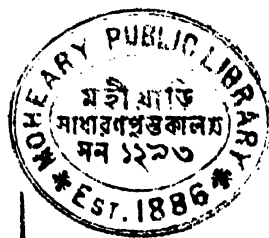
রত্নহার।

রায় মহাশয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রায়-মহাশয় গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন।

পৌষ মাস। প্রাতঃকাল। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে। শীতে অনেকেই ঘরের বাহির হইতে চাহিতেছে না। এই সময় কলিকাতার একটী অল্প-পরিসর রাজপথের মধ্য দিয়া রায়-মহাশয় গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন।

রায়-মহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর। গায়ে একখানি পাতলা নামাবলী মাত্র আবরণ। পদদ্বয় পাদুকাশূন্য। তিনি তন্ময়ভাবে—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে। গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে"—ইত্যাদি স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন;—আর ধীরে ধীরে গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ভৃত্য রামদাস, বস্ত্র ও তৈল-গামছা প্রভৃতি লইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে।

রায় মহাশয় এক মনে চলিয়াছেন; এক মনে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেছেন; এক মনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে যেন ডাকিল;—সহসা "রায় মহাশয়" "রায়-মহাশয়" শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে

প্রতিধ্বনিত হইল। কে যেন ডাকিতেছে বুঝিয়া, তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পার্শ্বস্থিত একটী অট্টালিকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটী যুবাপুরুষ তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন।

যুবাপুরুষের নাম—হরদয়াল সিংহ। বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাবিংশ বর্ষ। দেখিতে—কার্ত্তিকের ন্যায় কমনীয় কান্তি। অল্প দিন হইল, হরদয়ালের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার একমাত্র পুত্র হরদয়াল সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। একে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে অতুল বৈভবের একাধিপত্য লাভ হইয়াছে; সুতরাং অবস্থার অনুরূপ বাহ্যাড়ম্বরেরও তাঁহার কোনও ত্রুটি ছিল না। দ্বারে দৌবারিক সঙ্গীন উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে; বৈঠক, বন্ধু-বান্ধবের কলকল্লোল-ধ্বনিতে প্রতিনিয়ত মুখরিত হইতেছে; ঐশ্বর্য্য-সহচর চাটুকারগণের মনোমোহন বাক্যছটায় মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা করিতেছে। রায়-মহাশয় যখন হরদয়ালের বাটীর সম্মুখ দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, তৎকালে হরদয়াল মুখপ্রক্ষালনের জন্য বারান্দায় আসিয়াছিলেন। বৈঠকখানায় চায়ের আয়োজন চলিতেছিল।

এত প্রত্যুষে এতাদৃশ শীতে সামান্য একখানি নামাবলী মাত্র গায়ে দিয়া রায়-মহাশয় গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন;—হরদয়াল ইহাতে একটু কৌতূহলাক্রান্ত হন। পল্লীর মধ্যে রায়-মহাশয় একজন বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তি। ধনৈশ্বর্য্যে হরদয়ালের অপেক্ষা তিনি যে কোনও অংশে ন্যূন নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ, সেই প্রত্যুষে, বিনা শীতবস্ত্রে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, তিনি গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন!—হরদয়ালের ন্যায় সুখৈশ্বর্য্যপালিত ধনী-সন্তানের চক্ষে ইহা কৌতুকোদ্দীপক নহে কি?

রায়-মহাশয়, হরদয়ালের আহ্বানে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন; এমন সময়ে হরদয়ালের অনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; কহিল,—"বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।" হরদয়ালের পিতার

সহিত রায় মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। হরদয়ালকেও তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বিশেষতঃ, রায়-মহাশয়ের বাড়ীতেও হরদয়ালের গতিবিধি না ছিল, এমন নহে। সুতরাং হরদয়ালের আহ্বানে বিরুক্তি না করিয়া তিনি কর্ম্মচারীর অনুসরণ করিলেন; ভাবিলেন,—'না-জানি, কি গুরুতর প্রয়োজনেই হরদয়াল তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে।' ইত্যবসরে হরদয়াল শশব্যস্তে নামিয়া আসিলেন; প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে উপরের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, হরদয়াল কহিলেন,—"অনেক দিন হইতেই আপনাকে একটী বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে করিয়াছি। আজ হঠাৎ আপনার দর্শন পাওয়ায়, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন, কথটা খুলিয়া বলি।"

রায়-মহাশয় স্নেহব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিলেন,—"হরদয়াল! তুমি আমার পুত্রস্থানীয়। তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমায় বলিতে এত সঙ্কোচ বোধ করিতেছ? যে কথাই থাকুক, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পার।"

হরদয়াল কহিলেন,—"এই পৌষ মাসের দারুণ শীত। লোকে শীতে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না। এ সময়ে আপনি, একখানি পাতলা নামাবলী মাত্র গায়ে দিয়া, গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। আপনার ন্যায় বৃদ্ধের এত শীতে বাটীর বাহির হওয়াই অকর্ত্তব্য। এত বনাত-ফেলানেল গায়ে দিয়াও আমাদের শীত ভাঙ্গিতেছে না; আর আপনি খালি-গায়ে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন! আপনাকে এইভাবে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখিয়া আমার মনে বড়ই সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। আপনার তো কিছুরই অভাব নাই; তবে আপনি দীনের ন্যায় অনাবৃত দেহে চলিয়াছেন কেন? একখানি শীতবস্ত্র ব্যবহার করিলেই আপনার এ কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে। অথচ, আপনি কেন এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন?"

রায়-মহাশয় সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে

কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হরদয়াল, রায়-মহাশয়কে নীরব দেখিয়া, পুনরায় বলিলেন,—"আমার অনুরোধ, কল্য হইতে আপনি বিনা শীতবস্ত্রে গঙ্গাস্নানে যাইবেন না। আপনি সম্মতি-জ্ঞাপন করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রায়-মহাশয় আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। হরদয়ালের আগ্রহাতিশয্যে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আচ্ছা বাবা, "আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

রায়-মহাশয়ের উত্তরে হরদয়াল অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"এ কি! রায়-মহাশয় এ আবার কি বলেন! 'চেষ্টা করিয়া দেখিব'—এ তাঁহার কি উত্তর!" হরদয়াল প্রকাশ্যে কহিলেন,—"চেষ্টা করিয়া দেখিব বলিলে, আমার মনঃপুত হইতেছে না। আমার অনুরোধ,—আমার প্রার্থনা,—আপনি বলুন, শীতবস্ত্র ব্যবহার করিবেন।"

রায়-মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"বলিলাম তো, আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব। দেখিব,—কতদূর কি সম্ভব হয়!"

হরদয়াল কহিলেন,—"আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি আজই আমার শালওয়ালাকে আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব।"

রায়-মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"না, শালওয়ালাকে আজ আর পাঠাইতে হইবে না। আমি শীঘ্রই শীতবস্ত্রের জন্য ব্যবস্থা করিব। এ বিষয়ে তোমাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। যদি ভগবান দিন দেন, যদি সামর্থ্যে কুলান হয়, শীতকষ্ট নিবারণের জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা পাইব।"

এই বলিয়াই রায় মহাশয় উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কহিলেন,—"আপাততঃ বেলা অধিক হইয়াছে; এক্ষণে আমি গঙ্গাস্নানে চলিলাম। ভবিষ্যতে আর এক দিন এ সম্বন্ধে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব।"

রায়-মহাশয় গাত্রোত্থান করিলে, হরদয়াল পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত গিয়া রায়-মহাশয়কে আপ্যায়ন করিয়া আসিলেন। রায়-মহাশয় চলিয়া গেলেন; কিন্তু হরদয়ালের মনের সংশয় তখনও দূর হইল না। হরদয়াল ভাবিতে লাগিলেন,—"রায়-মহাশয় এমন কথা

বলিলেন কেন? তাঁহার অতুল সম্পদ, তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাঁহার বহুল জমিদারী-ভূসম্পত্তি; তিনি ইচ্ছা করিলে, কলিকাতা সহরটাকে শাল দোশালায় ছাইয়া ফেলিতে পারেন। অথচ তিনি কিনা, বলিয়া গেলেন—"যদি ভগবান দিন দেন, যদ সামর্থ্যে কুলান হয়, শীতকষ্ট নিবারণের জন্য আধ্যমত চেষ্টা পাইব।'—এ কি কথা! এ কি প্রহেলিকা!"

হরদয়ালের চিন্তার শেষ হইল না। কিন্তু রায় মহাশয় গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতঃপর রায় মহাশয় এক-মনে এক-ধ্যানে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। এইবার ভাগীরথীর প্রতি রায়-মহাশয়ের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। তিনি চাহিয়া —পূণ্যসলিলা পতিতপাবনী মা যেন সংসারের পাপরাশি বিধৌত করিয়া তরঙ্গভঙ্গে ভাসাইয়া লইতেছেন। মা'র সেই সন্তাপনাশিনী স্নিগ্ধ শান্ত স্নেহময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাণ যেন এক অপূর্ব্ব অনুপম আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদকণ্ঠে কাতরস্বরে তিনি ডাকিলেন,—"পতিতোদ্ধারিণী মা! এ অকৃতি অধমের গতি-মুক্তির পথ দেখাইয়া দে মা!" গঙ্গাগর্ভে অবতরণ মাত্র, তাঁহার কণ্ঠে আপনা-আপনিই যেন মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত সেই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাস্তোত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল,—

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা শৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তী ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেক্ষত,
ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ।

এবংবিধ স্তোত্রদশক আবৃত্তির পর, রায়-মহাশয় পুনরায় গঙ্গার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

প্রতিদিনই গঙ্গাস্নানে গিয়া স্নানান্তে রায় মহাশয় সন্ধ্যা-তর্পণাদি সমাপন করেন। স্নানের পর, অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় জলে দাঁড়াইয়া, তাঁহার সে কার্য্য সমাহিত হয়। আজিও স্নানান্তে সেইরূপভাবেই রায় মহাশয় তর্পণাহ্নিক সমাপন করিতে লাগিলেন। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানাবিষ্ট আছেন; সহসা এক বিকট আর্ত্তনাদ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; ভীষণ হাহাকার-শব্দে সহসা তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। রায়-মহাশয় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—একখানি নৌকা গঙ্গাগর্ভে মগ্নপ্রায়। আরোহি-গণের কাতর ক্রন্দনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়াছে; "ঐ নৌকা ডুবিল" "ঐ নৌকা ডুবিল" কোলাহলে তটভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন খানা 'পানসী' নৌকা, সেই মগ্ন-নৌকার দিকে ছুটিয়াছে।

নৌকাখানি উত্তরদিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছিল। গঙ্গায় তখন 'ভাটার' প্রবল টান আরম্ভ হইয়াছে; এদিকে, অনুকূল বাতাস পাইয়া, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়াছিল। নৌকাখানি তীরবেগে ছুটিতেছিল। এই সময় দক্ষিণ দিক হইতে একখানি 'লক' ষ্টীমার উত্তরাভিমুখে আসিতেছিল। ষ্টীমারের খালাসিগণ অথবা নৌকার মাঝিরা প্রথমে কেহই কোন বিপদের আশঙ্কা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু নৌকা ও ষ্টীমার উভয়ই যখন সম্মুখীন হইল, তখন আর সাবধানতার সময় নাই। তথাপি ষ্টীমারের কাপ্তেন-খালাসিগণ এবং নৌকার মাঝি-মাল্লাগণ পরস্পর সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিল; ষ্টীমার হইতে বংশীধ্বনি উত্থিত হইল; মাঝিরাও "সাবধান—সাবধান" করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল; এবং নৌকার আরোহিগণ চঞ্চল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল ফলিল না। নৌকার 'বাগ' ফিরাইতে না ফিরাইতে, "ধাক্কা লাগিল" "ধাক্কা লাগিল" বলিতে না বলিতে, ষ্টীমার আসিয়া নৌকার উপর পতিত হইল। নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল; আরোহিগণ জলমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল; মাঝিরা সাঁতরাইয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা পাইল; ষ্টীমারের কাপ্তেন, অধিকতর দ্রুতবেগে ষ্টীমার চালাইয়া, পলায়নে আত্মরক্ষা

করিল। নিমেষমধ্যে এই ব্যাপার সম্পন্ন হইল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে, চক্ষের উপর রায়-মহাশয় এই লোমহর্ষণ নৌকাডুবি প্রত্যক্ষ করিলেন।

জলমগ্ন নৌকায় মাঝিমাল্লা ব্যতীত চারি জন মাত্র আরোহী ছিলেন। বরাহনগরের একটী ভদ্রলোক, আপনার বৃদ্ধা জননীকে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, কালীঘাটে ৺কালী-দর্শনে যাইতেছিলেন; আর তাঁহাদের সঙ্গে একটী চাকর ছিল। নৌকা জলমগ্ন হওয়ায়, প্রধানতঃ এই চারিটী প্রাণী জলমগ্ন হইল। তখন সেই মগ্ন নৌকার আরোহীদিগের উদ্ধারের জন্য, দুই তিনখানি পানসী এবং বহু লোকজন সেইদিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল; এবং সকলের সমবেত চেষ্টায়, শীঘ্রই সেই ভদ্রলোকটীর, তাঁহার স্ত্রীর ও তাঁহাদের চাকরটীর উদ্ধার সাধন হইল। কিন্তু কর্ত্তার বৃদ্ধা জননীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নৌকায় তাঁহাদের যে সকল জিনিস-পত্র এবং বস্ত্রাদি ছিল, তাহারও কোনও সন্ধান হইল না। জননীর কোনও সন্ধান না পাওয়ায়, পুত্র ও পুত্রবধূ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের কাতরোক্তিতে যেন পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাহা হউক, কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু বৃদ্ধার সংজ্ঞাহীন দেহ উত্থিত হইল। তখন, তাঁহার পরিধানের বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত জলে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই অচৈতন্য অবস্থায় একখানি গামছা মাত্র আবরণ দিয়া, মাঝিরা বৃদ্ধাকে তীরে আনয়ন করিল। অতঃপর বিধিমতে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল।

যে ঘাটে রায়-মহাশয় স্নান করিতেছিলেন, তাহারই পার্শ্বের ঘাটে এই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুতরাং রায়-মহাশয় এবং রামদাস উভয়েই সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং জলমগ্ন ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। যে সময় বৃদ্ধার সংজ্ঞাহীন দেহ তীরে উপনীত হইল, বৃদ্ধার গাত্রাবরণের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়াছিল। একে দারুণ শীত; তাহাতে বৃদ্ধার সংজ্ঞাহীন দেহে আর্দ্র গামছা-মাত্র আবরণ! সুতরাং বৃদ্ধাকে পরাইবার জন্য একখানি শুষ্ক বস্ত্রের প্রয়োজন হইল। কিন্তু এ অসময় গঙ্গার

যাটে শুষ্ক বস্ত্র কোথায় মিলিবে? কাহার নিকট খা বলেও, কেহ তাহা দিতে চাহে কি? বৃদ্ধার অনাবৃত দেহ দর্শনে, রায়-মহাশয়ের মনে, তাঁহার স্নানান্তে পরিধানের জন্য আনীত, দ্বিতীয় বস্ত্রখানির কথা উদয় হইল। তিনি তাড়াতাড়ি রামদাসকে নিকটে ডাকিয়া সেই বস্ত্রখানি বৃদ্ধার জন্য দিতে বলিলেন। রামদাস কি যেন কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু রায়-মহাশয়ের মুখের পানে তাকাইয়া, সে কথা তাহার আর বলিতে সাহস হইল না। তাড়াতাড়ি সেই বস্ত্রখানি বৃদ্ধার পুত্রের হস্তে প্রদান করিয়া, রামদাস সরিয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা সংজ্ঞালাভ করিলে, রায়-মহাশয়, জলমগ্ন ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যাদি গ্রহণ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের গৃহ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তিনি আপন সেনাস্নান কর্মে ব্যাপৃত হন।

স্নান-আহ্নিক সমাপনান্তে রায়-মহাশয় গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। বলা বাহুল্য, আপনার পরিধেয়-বস্ত্র বৃদ্ধার জন্য প্রদান করায়, তাঁহাকে আর্দ্রবস্ত্রেই বাটী আসিতে হইতেছিল। আসিবার সময়, হরদয়ালের সঙ্গে পুনরায় যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এজন্য তিনি একটু পাশ কাটাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কি বিধিনির্ব্বন্ধ!—যে পথ দিয়া তিনি প্রত্যাগত হইতেছিলেন, সেই পথেই পুনরায় হরদয়ালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হরদয়াল "জুড়ী" হাঁকাইয়া সেই পথ দিয়া বেড়াইতে চলিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে দুই জন বন্ধু ছিল; সুতরাং রায়-মহাশয়কে দেখিয়াও তিনি আর "জুড়ী" থামাইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না! দূর হইতেই রায়-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু গঙ্গাস্নানান্তে প্রত্যাগমন-কালে রায়-মহাশয় যে আর্দ্র বস্ত্রে আসিতেছিলেন,—এ চিত্র যেন তাঁহার হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। রায়-মহাশয় শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন নাই কেন, ইতিপূর্ব্বে সেই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল। এখন, রায় মহাশয় আর্দ্রবস্ত্রে চলিয়াছেন কেন, ইহাতে তাঁহার প্রাণে আবার যেন এক নূতন তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"তবে কি রায়-মহাশয়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পথে যাইবার সময় রামদাস জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরদা ম'শায়, হরদয়াল বাবু তখন আপনাকে কি বল্‌ছিলেন ?"

রামদাস, রায়-মহাশয়ের ভৃত্য ও বয়স্য উভয় স্থানীয়। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, পিতৃমাতৃহীন অসহায় রামদাস, রায়-মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তদবধি সেই বাড়ীতেই সে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাকে আবশ্যকানুরূপ সুশিক্ষা-দানেও রায়-মহাশয় ত্রুটি করেন নাই। অধিকন্তু, রায় মহাশয়, তাহাকে আদর করিয়া 'নাতি' বলিয়া সম্বোধন করেন; রামদাস, তাঁহাকে 'ঠাকুরদা ম'শায়' বলিয়া ডাকিয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে সত্য সত্যই এখন যেন নাতি-ঠাকুরদাদা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। তাই রামদাস, রায়-মহাশয়ের নিকট কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে কদাচ সঙ্কোচ বোধ করে না; এবং রায় মহাশয়ও তাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাণের কথাটি পর্য্যন্ত কহিয়া থাকেন সুতরাং আজ হরদয়ালের সহিত কথাবার্ত্তার বিষয় রামদাস যখন জানিতে চাহিল, রায়-মহাশয় তাহাই বা না জানাইবেন কেন ?

রায়-মহাশয় কহিলেন,—"রামদাস! কথাটা বড়ই পুরাতন কথা! তুমি মাঝে মাঝে আমায় যে কথা বল, গৃহিণী পূর্ব্বে প্রায়ই যে কথা আমায় বল্‌তেন, পুত্রেরা যে জন্য অনেক সময়ই আক্ষেপ ক'রে থাকে, কথাটা সেই পুরাতন কথা!—আমার শীতবস্ত্র গ্রহণের কথা! হরদয়াল আমায় অনুরোধ করেছেন,—আমায় শীঘ্রই একখানা শীতবস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।"

রামদাস একটু উল্লাস-আবেগে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, তিনি তো ভাল কথাই বলেছেন! এই পৌষ মাসের দারুণ শীত! খালি গায়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়া কি ভাল ?—হঠাৎ একটা ব্যায়রাম হতে পারে তো!"

রায়-মহাশয় কহিলেন,—"রামদাস! যা বলছ, সব ঠিক কথা। কিন্তু এই শীতে এমন অনেক গরীব লোককে দেখেছি,—যাদের একখানি মাত্র বস্ত্র সম্বল; স্নানের পর যারা ভিজে কাপড়ের এক খুঁট পরিধান ক'রে, অন্য খুঁট

শুকিয়ে নেয়! রামদাস!—তাদের তো কৈ 'ব্যায়রাম-পীড়া হয় না? যত ব্যায়রাম-পীড়া কি তবে আমার জন্যই অপেক্ষা করে আছে?"

রামদাস কহিল,—"ঠাকুর-দা' মশায় আপনার কথার উত্তর দিই, সে সাধ্য আমার নাই। তবে অবস্থা-অনুসারে ব্যায়রাম-পীড়া আসিয়া থাকে, এ কথা কি ঠিক নয়?"

রায়-মহাশয় উত্তর দিলেন,—"রামদাস! তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। এই শীতে অনেক গরীব-দুঃখীদের ছেলে-মেয়েরা পাতলা একটু কাপড় গায়ে দিয়ে বা খালিগায়ে 'হি হি' ক'রে কাঁপছে; অথচ, তাদের তেমন কোনও ব্যায়রাম-পীড়া নাই। আর আমাদের বাড়ীর ছেলে-পিলেদের যতই গরমে রাখি, যতই সাবধনে রাখি,—ততই তাদের ব্যায়রাম পীড়া লেগেই আছে;—আজ সর্দ্দি, কাল কাশী, পরশু গা-গরম,—এ সকল তো তাদের নিত্য সহচর।"

রামদাস সোৎসাহে কহিল,—"আমিও তো তাই বল্‌ছিলেম। আপনাদের মত সুখী লোকের এ শীতকষ্ট কি সহ্য হতে পারে? হরদয়াল বাবু খুব ভাল কথাই বলেছেন।"

রায়-মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া পুনরপি কহিলেন,—"কি জান, রামদাস! এবিষয়েও একটু পার্থক্য আছে। যাহাদিগকে নিজে উপার্জ্জন ক'রে নিজের চেষ্টায় বড়-মানুষ হ'তে হয়, তাদের কথা এক; আর যাঁহারা বড়-মানুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। যাহারা আপন অধ্যবসায়ে বড়-মানুষ হয়, দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে তাহাদের শরীরের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যায়; শীতে বা গ্রীষ্মে তাহাদের বড়-একটা আসে-যায় না। তবে যাহারা আজন্ম-সুখৈশ্বর্য্যের কোমল ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত, তাহাদের জন্যই যত কিছু সাবধানতার প্রয়োজন। রামদাস!—মনে রেখো, সকলের অভাব-জ্ঞান সমান নয়।"

রামদাস।—"আপনি ঐ কথাই বলে থাকেন!"

রায়-মহাশয়।—"রামদাস! অনেক কষ্টেই ও কথা বল্‌তে হয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞাতিরা যখন বাড়ীর বার করে দেয়, রামদাস, সেই একদিন; আর আজ আবার এই এক দিন! দুটী আপগোণ্ড-ভগ্নী ও জননীর হাত ধরে বাড়ীর বার হয়েছিলেম, সেই এক অবস্থা;—আর আজ আমার এই রাজার অবস্থা!"

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রায়-মহাশয় একটী অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামদাস পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিল। এতক্ষণ যাঁহারা না চিনিতে পারিয়াছেন, এইবার বোধ হয় তাঁহারা রায়-মহাশয়কে চিনিতে পারিবেন। রায় মহাশয়ই এই অট্টালিকার অধিকারী।

রায়-মহাশয়কে কে না জানেন? কলিকাতায় কায়স্থ-সমাজে রমাপ্রসাদ রায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি বয়সে যেরূপ প্রবীণ, বুদ্ধিতেও তদ্রূপ বিচক্ষণ। অনেকে মনে করেন,—রায়-মহাশয় যেন সেকাল ও একালের সম্বন্ধ-সূত্র; তাঁহার লোকান্তরের পরই যেন অতীত ও বর্ত্তমানের সকল সংস্রব লোপ পাইবে! রায় মহাশয় দেখিতে মধ্যমাকৃতি। দেহ দীর্ঘ, কিন্তু কৃশ নহে! বর্ণ—উজ্জ্বল শ্যাম। শ্মশ্রু-গুম্ফ ক্ষৌরমুণ্ডিত; পাকাপক কি অপরিপক্ক, সহজে বুঝিবার উপায় নাই। মস্তকের কেশ-কলাপ অর্দ্ধশুভ্র, অর্দ্ধ-পক্ক; কতক পাকিয়াছে, কতক পাকে পাকে হইয়াছে। দন্তপংক্তিদ্বয় দৃঢ় ও সক্ষম; একটীও শিথিল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এখনও তিনি সমূহ সামর্থ্যবান আছেন। পঁয়ষট্টি বৎসরের বয়স্ক বৃদ্ধের সামর্থ্যাসামর্থ্যের এই পরিচয়ে, অধুনা অনেকের হয় ত বিশ্বাস না হইতে পারে; এ স্থানেই হয় তো তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এ আখ্যায়িকা-পাঠ পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু উপায় কি? রায়-মহাশয় যে সকলেরই পরিচিত! তিনি যে সাক্ষাৎ গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিতেছেন! সুতরাং অবিশ্বাস করিলেই বা উপায় কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রায়-মহাশয়ের বাড়ী হইতে হরদয়ালের বাড়ী এক পোয়া পথ মাত্র ব্যবধান, একই রাস্তার ধারে উভয় বাড়ী অবস্থিত। রায়-মহাশয়ের বাড়ী দক্ষিণ-দ্বারী। সদর দরজার দিকে তাকাইলে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড ঠাকুর-দালানের প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। দুর্গোৎসবের সময় মা-দশভুজা যখন সেই ঠাকুর-দালান জুড়িয়া বিরাজ করেন, তখন কি অপূর্ব্ব শোভারই বিকাশ হয়। সে সময়ে সে পথে চলিতে হইলে, রায়-মহাশয়ের ঠাকুর-দালানের প্রতি না তাকাইয়া কেহই ফিরিতে পারে না। ঠাকুর-দালানের উত্তরে অন্দর মহল; পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে চক-মিলান বহির্বাটী। বহির্বাটীর দরজায় প্রবেশ করিতে, বামে ও দক্ষিণে, নীচের ঘরে আমলারা কাজকর্ম্ম করে। উপরে রায়-মহাশয়ের বসিবার বৈঠকখানা।

বৈকালে রায় মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ প্রণিপাতপূর্ব্বক পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তার পর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি আমায় ডাক্‌ছিলেন?"

রায়-মহাশয় উত্তর দিলেন,—"হাঁ বাবা! একটা পরামর্শের জন্য তোমায় ডেকেছি। এস; এদিকে বস; কথাটা বলিতেছি।"

হরিনারায়ণ দণ্ডায়মান ছিলেন। পিতার আদেশ-প্রাপ্তে সঙ্কুচিতভাবে তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। হরিনারায়ণ উপযুক্ত পুত্র। বয়ঃক্রম ত্রিংশ বর্ষ।

রায়-মহাশয় পুত্রকে কহিলেন,—"হরদয়ালের অনুরোধের কথা, সমস্তই শুনিয়াছ। এই দারুণ শীতের সময় শীতবস্ত্র ব্যবহারের জন্য হরদয়াল আমায় পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু আমি ভাবিতেছি, এ সময় টাকার সুদান করিতে পারিব কি?"

পুত্রের সহিত পিতার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ হরদয়াল

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরদয়ালকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রায়-মহাশয়, অতি আনন্দ-ব্যঞ্জক-স্বরে "এস বাবা—এস বাবা" বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। হরদয়াল, হরিনারায়ণের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে, রায়-মহাশয় কহিলেন,—"এই বাবা!—তোমারই কথা হইতেছিল! ভাবিতেছি,—এ সময় শীতবস্ত্র গ্রহণে টাকার কুলান করিতে পারিব কি না? দেওয়ানজী বলেন, —'সম্মুখে লাটের কিস্তি আছে, বিশেষ এবার দুর্ব্বৎসর, টাকাকড়ি আদায়-পত্র হওয়ার আশা বড় কম!' তিনি তাই বারণ বল্লেন—'এ সময় এক কপর্দ্দকও কোনও বিষয়ে ব্যয় করা অনুচিত।' তাই ভাবিতেছি!"

রায়-মহাশয়ের পত্রদানের ব্যাপারে হরদয়াল বড়ই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলেন। একণে পুনরায় রায়-মহাশয়ের মুখে এতাদৃশ ভাবনার কথা শুনিয়া, বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হরদয়ালের মনে হইতে লাগিল,—"তবে কি রায়-মহাশয় কৃপণের চূড়ামণি? তবে কি তিনি আত্ম-বঞ্চনায়—অপরকে কষ্ট দিয়া—অর্থ-সম্পদের অধিকারী হইতে চাহেন?" যাহা হউক, হরদয়াল মনকে প্রবোধ দিলেন,—"যখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে, তখন সমস্তই বুঝা যাইবে? দেখি—হরিনারায়ণই বা কি উত্তর দেন?"

রায়-মহাশয়ের প্রশ্ন শুনিয়া, হরিনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরবে ছিলেন। পিতা আরও কি বলেন, তাহা শ্রবণ করাই তাঁহার সে নীরবতার উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে হরদয়াল আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার উত্তরে আরও একটু বিলম্ব পড়িয়া গেল। সুতরাং রায়-মহাশয় পুনরপি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল হরিনারায়ণ! এ বিষয়ে তোমার কি মত? এ বয়সে এ অবস্থায় আমি যখন শীতবস্ত্র গ্রহণ করিব, তাহা যথাযোগ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু টাকার সঙ্কুলান হইবে কি?"

এ প্রশ্নে হরদয়াল আরও যেন সংশয়-সমস্যার মধ্যে পতিত হইলেন। তিনি একবার ভাবিলেন,—"রায়-মহাশয় কি ঘোর কৃপণ!" আবার ভাবিলেন,—"তিনি কি ভয়ঙ্কর দাম্ভিক!"

হরদয়াল এতাদৃশ সংশয়-দোলায় দোলায়মান; হরিনারায়ণ পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইতেছেন,—অর্দ্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়াছেন; এমন সময় আবার একটা বাধা পড়িল। রাম সিং দরোয়ান ব্যস্ত-সমস্তে বৈঠকখানার দরজায় আসিয়া কহিল,—"হজুর! একঠো সা'ব মোলাকাত কর্‌নে আয়া!" এই বলিয়া, সাহেবের নামের একখানা 'কার্ড' হরিনারায়ণের হস্তে প্রদান করিল। সাহেব দরজার সম্মুখে গাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন—প্রকাশ পাইল। অগত্যা অন্য কথাবার্ত্তা স্থগিত রাখিয়া সকলেই তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বৈঠকখানার পার্শ্বের একটা প্রকোষ্ঠে কয়েকখানা চেয়ার ও একটা টেবিল পাতা ছিল। রায়-মহাশয়ের একজন কর্ম্মচারী সাহেবকে আনিয়া তথায় উপবেশন করাইলেন। হরদয়াল, হরিনারায়ণ ও রায়-মহাশয় তিন জনেই সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য আগুয়ান হইলেন। সাহেবের সঙ্গে একটী বাঙ্গালী বাবু ছিলেন। তাঁহার নাম—রসময় তরফদার। বয়স পঞ্চাশ বাহার। মুখটা গোলগাল; চোখদুটা ঘোরালো; রংটা কালোকালো; গোঁপ জোড়াটা জমকালো। পরিধানে সাদা ধুতির উপর একটা সাদা চাপকান। মাথায় সাদা চাদরের পাগড়ী। সাহেবের পরিচয়-প্রদান উদ্দেশে তরফদার বাবু নানা কথার অবতারণা করিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া যেন খই ফুটিতে লাগিল। কথাচ্ছলে তিনি রায়-মহাশয়কে বুঝাইতে লাগিলেন,—"সাহেব উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারী; লাট-সাহেবের স্ত্রীর সহিত উহাঁর সম্বন্ধ আছে; উনি ইচ্ছা করিলে, অনেককেই রায়-বাহাদুর ও রাজা-বাহাদুর করিয়া দিতে পারেন। উহাঁকে তুষ্ট করিলে, রাজদরবারে, গবর্ণমেণ্টের নিকট, বহু সম্মান-প্রতিপত্তির আশা আছে।" প্রথমে এইরূপে সাহেবের পদমর্য্যাদি খ্যাপন করিয়া, তরফদার বাবু কহিলেন,—"নাইনিতালে সাহেবদের একটা 'বাথ-রুম' স্নানাগার হইবে। বড়লাট সাহেব তাহার উদ্যোগী। সেই স্নানাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি কিছু অর্থ-সাহায্য করেন, সাহেব আপনার বাড়ীতে সেই উদ্দেশ্যেই পদার্পণ

করিয়াছেন। ভরসা করি, আপনি সাহেবের যথোচিত সম্মান-রক্ষা করিবেন।” এই সূত্রে তরফদার বাবু আরও জানাইয়া দিলেন—“রায়-মহাশয়ের যে জেলায় জমীদারী আছে, সেই জেলার মাজিষ্ট্রর সাহেব, এই সাহেবের ভগ্নীপতি।” ইত্যাদি প্রকার ভয়-ভরসা আশা-আশঙ্কার সমাচার জ্ঞাপন করিয়া, তরফদার বাবু, রায়-মহাশয়ের সম্মুখে একখানি চাঁদার খাতা বাহির করিলেন। সাহেব, চুরুটের ধূমপান করিতে করিতে, তরফদার বাবুর কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিতেছিলেন। চাঁদার খাতা বাহির হওয়ায়, এইবার তিনিও হাসিয়া হাসিয়া ইংরেজীতে কহিলেন,—“আশা করি, বাবু আপনি অন্যূন দশ সহস্র টাকা এই শুভ উদ্দেশ্যে চাঁদা স্বাক্ষর করিবেন।” সাহেবের কথার সঙ্গে সঙ্গেই তরফদার বাবু দেখাইলেন,—এই দেখুন,—গোদ্রোয়-দেশের রাজা কত টাকা দিয়াছেন; এই দেখুন,—লণ্ডন ষ্ট্রীটের রাজা কত টাকা দিয়াছেন। ফলতঃ সাহেব ও তরফদার মিলিয়া, নানাপ্রকারে রায়-মহাশয়কে জপাইতে লাগিলেন।

রায়-মহাশয় প্রথমেই একবার বলিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,—“আমার দ্বারা কোনও সাহায্য সম্ভবপর নহে।” শেষেও তিনি সেই কথাই কহিলেন। কিন্তু তরফদার বাবু কোন ক্রমেই ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি প্রলোভনের উপর প্রলোভনের মাত্রা ক্রমেই চড়াইতে লাগিলেন; পরিশেষে, সাহেব শুধু হাতে ফিরিলে আশঙ্কার কারণ আছে প্রভৃতি বলিতেও ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু রায় মহাশয় অটল—অচল। দশ হাজার হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দশ টাকা পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণের প্রস্তাব হইল। কিন্তু রায়-মহাশয় একটী কপর্দ্দক পর্য্যন্ত প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না; বরং পরিশেষে বলিয়া দিলেন,—“যে উদ্যম আমার নিকট ব্যর্থ করিতেছেন, সে উদ্যমে অন্যত্র চেষ্টা করিলে হয় তো সুফল ফলিতে পারিত।” অগত্যা, “আর আশা নাই” বুঝিয়া, সাহেব ও তরফদার বাবু চলিয়া গেলেন। তবে যাইবার সময়ও তরফদার বাবু বলিতে ত্রুটি করিলেন না,—“আপনি স্থিরচিত্তে আর একবার ভাল

করিয়া এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমাদের অনুষ্ঠান-পত্র ও ঠিকানা আপনার কাছে রাখিয়া গেলাম।”

সাহেবের অনুরোধ এবং রায়-মহাশয়ের প্রত্যাখ্যান-ব্যাপারে হরদয়ালের মন আর এক অভিনব চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইল। হরদয়াল ভাবিতে লাগিলেন,—“এত বড় একটা সাহেবকে এরূপভাবে বিদায় করা, রায়-মহাশয়ের ভাল কাজ হইল কি? এমন একটা সাহেব তুষ্ট হইলে, কতই নাম-ডাক পশার-প্রতিপত্তির সম্ভাবনা ছিল। আমার নিকট যাইলে, আমি কখনই সাহেবের সহিত এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতে পারিতাম না। কোনও স্থিরমস্তিষ্ক ভদ্রলোক কি কখনও অত বড় একটা সাহেবকে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে?” অতএব, হরদয়াল স্থির করিলেন,—“রায়-মহাশয়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে!” তিনি আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—“রায়-মহাশয় হয় ঘোর কৃপণ, নয় তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক!”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাহেব চলিয়া গেলেন। রায়-মহাশয় প্রভৃতি আবার বৈঠকখানা-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বৈঠকখানায় একটী ভদ্রলোক রায়-মহাশয়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। কে তিনি? কি জন্য অপেক্ষা করিতেছেন? ভদ্রলোকটী ব্রাহ্মণের আসনে উপবিষ্ট। রায়-মহাশয়ের বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণগণের বসিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রায়-মহাশয় যেখানে উপবেশন করেন, তাঁহারই দক্ষিণপার্শ্বে ফরাসের উপর একখানি গালিচা পাতা থাকে। উহাই ব্রাহ্মণ-দিগের বসিবার আসন। ভদ্রলোকটী বৈঠকখানা-গৃহে প্রবেশ করিলে, তাঁহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া, ভৃত্য রামদা তাঁহাকে সেই আসনে বসিতে দেয়।

রামদাস তাঁহাকে সেই আসনে বসাইয়াছে, সুতরাং সন্দেহ করিবার আর কোনও কারণ রহিল না। রায়-মহাশয়, পিতাপুত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হইল।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, প্রথমে মনে হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণ পীড়িত। তাঁহার দেহ শীর্ণ; মুখ বিবর্ণ—বিষণ্ণ; নয়ন জলভারাক্রান্ত। পীড়ার লক্ষণ ভিন্ন, ইহাতে আর কি মনে হয়? তবে কি ব্রাহ্মণ বার্দ্ধক্যের চরম-সীমায় উপনীত? চিবুক অধিলুণ্ঠিত; গণ্ডাস্থি প্রকট-পরিদৃশ্যমান; কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের কেশগুলি স্খলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বার্দ্ধক্য ব্যতীত ইহাকে আর কি বলিতে পারি? কিন্তু পরক্ষণেই প্রতীত হইল,—না—না, সে সব কিছুই নয়;—ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য-নিপীড়িত। তাঁহার ললাটে বিষাদের—বিড়ম্বনার—দুশ্চিন্তার বিভীষিকাময়ী রেখা যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পরিধেয় ছিন্নমলিন বসনাভ্যন্তরে তাঁহার দারিদ্র্য-লক্ষণ স্বতঃপ্রকাশমান। ব্রাহ্মণের গায়ে একটী শতছিন্ন পিরিহান ছিল; চাদরের আবরণে তাহা ঢাকিবার চেষ্টা হইলেও, ব্রাহ্মণ তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র, চাদর ও পিরিহানের প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেগুলি যেন অনেককাল রজকালয়ের সংস্কার-সংশ্রবে বঞ্চিত আছে। তবে মধ্যে মধ্যে সাবান বা ক্ষার সংযোগে গৃহেই যে তাহাদের সংস্কার-সাধন-ক্রিয়া সমাহিত হয়, তৎসম্পর্কে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ব্রাহ্মণের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, রায়-মহাশয় বুঝিলেন,—ব্রাহ্মণ পীড়িত বা বৃদ্ধ নহে; দারিদ্র্যই তাঁহার তাদৃশ অবস্থার মূলীভূত। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম চল্লিশ বিয়াল্লিশ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তাঁহার বয়স ষাটের কোটা পার হইয়াছে। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কান্তিপুষ্টির সমূহ লক্ষণ বিদ্যমান আছে; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে, জরাজীর্ণ কৃশ ভগ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হইতে পারে না। হায় দরিদ্রতা! তুমি অঘটন ঘটন-পটীয়সী!

আসন গ্রহণান্তর রায় মহাশয় ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আমি বড় বিপন্ন অবস্থায় আজ আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি। আপনি ভিন্ন আমার দায় উদ্ধারের কোনই উপায় নাই।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রায়-মহাশয় ব্রাহ্মণের মুখের প্রতি তাকাইয়া, কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন,—"আপনার এমন কি বিপদ উপস্থিত! আমিই বা আপনাকে কি প্রকারে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব? আমায় সকল কথা খুলিয়া বলুন; যদি সাধ্যাতীত না হয়, আমি সেজন্য চেষ্টা করিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ অশ্রুগদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার জাতিপাত হয়। আপনি আমার জাতরক্ষা করুন।" আবার ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রায়-মহাশয় এবার কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বিপদ? আপনার কেন জাত যায়? আমি তো আর অন্তর্যামী নই যে, আপনার মনের কথা বুঝিতে পারিব? আপনি সকল কথা খোলসা করিয়া বলুন। যদি কিছু উপায় থাকে, দেখা যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর দিলেন,—"আমার কন্যার বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা কুলীন; আমাদের কন্যার বিবাহে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমার ঘরে একটী কপর্দকও সংস্থান নাই। কি করিয়া আমার জাতি-কুল রক্ষা হয়, কি করিয়া আমি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাই, আপনাকে তাহার উপায়-বিধান করিতে হইবে। আমি আপনার নিকট কন্যাদায় উদ্ধার-প্রার্থী।"

রায়-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত টাকা হইলে আপনার এ দায় উদ্ধারের সম্ভাবনা।"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"অন্যূন এক সহস্র টাকা।"

রায়-মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার কি পর্য্যন্ত সংস্থান আছে?"

ব্রাহ্মণ।—"কিছুই নাই।"

রায় মহাশয়।—"তবে কিরূপে এ দায় উদ্ধার সম্ভবপর?"

ব্রাহ্মণ।—"আপনার দয়া।"

রায় মহাশয় কহিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমার দয়ায় আপনার কি হইতে পারে? আমি আপনার কি করিতে পারি? আপনি অন্য চেষ্টা করিলেন না কেন?"

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"এ পর্য্যন্ত কোনও চেষ্টারই আমি ত্রুটি করি নাই। প্রথমতঃ, ঋণ-গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলাম; বন্ধু-বান্ধবের হাতে-পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া সাহায্য চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা কেবলই গয়ংগচ্ছ করিয়া আমার সময় নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে কেহ আমায় নিরাশ করেন নাই; কিন্তু পরোক্ষে বলিয়াছেন,—'ওর আর আছে কি? ওর কি দিতে পারিব?' উপকার যত না হউক, তাঁহাদের জন্য বরং আমি বিপদগ্রস্তই হইয়াছি। তাঁহারা যদি আশা দিয়া না রাখিতেন?"

হরদয়াল এতক্ষণ নীরবে সকলই শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি উপর-পড়া হইয়া কহিলেন,—"সংবাদপত্রে অনেক রাজা মহারাজার দান-ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি তাঁহাদের কাহারও নিকট চেষ্টা পান নাই কেন?"

এ কি! ব্রাহ্মণের চক্ষু ছলছল কেন? এ তো ক্রন্দনের অবসর নয়? ব্রাহ্মণ অশ্রুসংবরণ করিয়া কহিলেন,—"আপনারা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজেই বলিতে হইতেছে। নহিলে, সে সকল কথা মনে করিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। সে চেষ্টারও আমি ত্রুটি করি নাই। আজি এক বৎসর কাল আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যাঁহারা অত্যন্ত দয়ার আধার, যাঁহারা কাহাকেও কখনও নিরাশ করেন না, তাঁহারা কেহ কেহ দুই চারি টাকা পর্য্যন্ত ভিক্ষা-দানে স্বীকৃত ছিলেন বটে; কিন্তু সে সাহায্যে আমার কি হইবে? কাজেই আমি তৎসমুদায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।"

রায়-মহাশয়।—"আপনি কি রাজা ধরন্ধরলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি বিপন্নের দায়-উদ্ধারে মুক্ত হস্ত।"

ব্রাহ্মণ।—"আজ্ঞে, প্রথম যেদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমায় বড়ই আপ্যায়ন করিলেন। কত টাকা লাগিবে, কবে টাকা দিতে হইবে,—ইত্যাদি জানিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে দিলেন। কিন্তু তারপর যে-দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, আর তিনি দেখা করিলেন না। কোনও দিন শুনিলাম—শরীর অসুখ; কোনও দিন শুনিলাম—বড় ব্যস্ত; কোনও দিন শুনিলাম—অন্দরে আছেন; কোনও দিন শুনিলাম—বাগানে গিয়াছেন। শেষ একদিন উপর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন,—'এ সব বিষয়ে সাহায্য করিতে গেলে আর সংসারে থাকা চলে না।' যে লোকটী আমায় এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, তিনি একটু মুচকী হাসিয়া আরও কহিলেন,—'যদি কাহারও বেশ্যা কাহাকেও টাকার জন্ত ভাড়াইয়া দিত, রাজা বাহাদুর তাঁহাকে সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না! পাত্র ও প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়াই রাজা বাহাদুর দান করিয়া থাকেন।' আমি লজ্জায় অধোবদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।"

রায়-মহাশয়ও মনে মনে ছি ছি করিয়া জিব কাটিলেন। কিন্তু হরদয়াল পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—"মহারাজ মোহনলালের সহিত আপনি দেখা করিয়াছিলেন কি?"

ব্রাহ্মণ ঘৃণা ও দুঃখবিমিশ্র স্বরে উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে, অনেক সুপারিশের জোরে গত বুধবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কি বলিলেন—তাহা শুনিবেন কি? বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তিনি বলিলেন কি না—'কুলীন মৌলিক আবার কি? ব্রাহ্মণ-শূদ্র আবার কি? জগদীশ্বর কাহাকেও ব্রাহ্মণ বা কাহাকেও শূদ্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সকলেই—'

রায়-মহাশয় আপন কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"না—না, আর বলিতে হইবে না। দেশের অবস্থা সকলই

বুঝিয়াছি।” মনে মনে কহিলেন—“হা ভগবান!—ইহাঁরাই আবার হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি!”

অতঃপর রায়-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আচ্ছা, আমার ন্যায় দরিদ্রের নিকট আপনাকে আসিবার জন্য কে উপদেশ দিয়াছে?”

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—“আজ্ঞে, এ উপদেশ আমায় অন্য কেহ দেয় নাই। আমার স্বভাবই আমাকে আপনার নিকট টানিয়া আনিয়াছে। তবে আপনার নিকটেও যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, আর কোথাও যাইব কি না,—বলিতে পারি না।”

রায় মহাশয়।—“আপনার বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয়?”

ব্রাহ্মণ।—“আমি 'ডাল' সাহেবের স্কুলে মাষ্টারী করি। পাঁচশটি টাকা মাত্র বেতন পাই। প্রাইভেট পড়াইয়াও পাঁচটী টাকা উপার্জ্জন হয়। কিন্তু সংসারে পোষ্যের সংখ্যা পাঁচ ছয়টী। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে বাসাভাড়া প্রভৃতি যোগাইয়া কি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।”

রায়-মহাশয় এইবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার বাড়ী-ঘর কোথায়?”

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—“বাড়ী-ঘর যদি থাকিত, তাহা হইলে কি আর কন্যাদায়ের জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী হইতাম? ভদ্রসন্তান, সামান্য সংস্থান থাকিতে, কখনও ভিক্ষাপ্রার্থী হইতে পারে কি? আপনি কৃতকর্ম্মা; আপনি জ্ঞানী; আপনাকে কি বেশী কিছু বুঝাইতে হয়? যাহা হউক, যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন সকলই বলিতেছি। হুগলী জেলার খানাকুল-গ্রামে আমার পৈত্রিক বাস-স্থান; সেখানে আমার ভদ্রাসন ছিল। কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল, আমার সে ভদ্রাসনবাটী নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্য গ্রামের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট পাঁচ শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সুদে আসলে সেই ঋণের দায়েই আমার বাস্তুভিটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ আপনি নিশ্চিত জানিবেন, আমার কোনও

সংবাদ থাকিতে আমি আপনার বাহির হই নাই।” ব্রাহ্মণ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চোখ মুছিলেন।

রায়-মহাশয়।—“আপনার কন্যার বিবাহের পাত্রাদি ঠিক হইয়াছে?”

ব্রাহ্মণ।—“আজ্ঞে, টাকার ঠিক হইলেই সকল বিষয় ঠিক হইতে পারে।”

রায়-মহাশয়।—“আচ্ছা, আপনি কা’ল একবার আসিবেন। আমি কতদূর কি করিতে পারি, তাহার পরামর্শ করিব। তবে আমার একটী প্রার্থনা, আমি যদি আপনার কন্যার বিবাহে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, সে কথা আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। সাহায্য-দানের ইহাই আমার প্রধান সর্ত্ত।”

ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সপুত্র রায়-মহাশয়, তাঁহার পদধূলি গ্রহণে কৃতার্থ হইয়া, উত্তর দিলেন,—“আপনার আশীর্ব্বাদে যেন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।”

হরিনারায়ণ এ পর্য্যন্ত কোনই কথাবার্ত্তা কহেন নাই। তিনি একইভাবে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে, রায়-মহাশয় পুত্রকে কহিলেন,—“আগে বিবেচনা করা যাউক, ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধারের বিষয় কি হইবে। এ বিষয়ে তোমার কি মত, বল দেখি?”

পুত্র হরিনারায়ণ, পিতার চরণপ্রান্তে চাহিয়া, নতমুখে উত্তর দিলেন,—“বাবা! যদি অনুমতি দেন, আমরা একটা সাধের কথা বলি।”

পিতা।—“কি কথা, নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার।”

পুত্র।—“আমার বড় সাধ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য যে টাকা লাগিবে, সে টাকাটা আমিই দিব। আপনি যে আমার জলপানি বলে মাস মাস ২০৲ কুড়ি টাকা করে দেন, সে টাকার একটিও আমার খরচ হয় নাই। সেই টাকা জমে-জমে এখন আমার এগার-শ’ টাকা মজুত হয়েছে। সে টাকার সদ্ব্যবহার, এই ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধারের অপেক্ষা আর কি হইতে

পারে? তাই আমার বড়ই সাধ,—ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধারে আমার সেই টাকাটা খরচ হয়। আপনি অনুমতি দেন,—ইহাই আমার প্রার্থনা।”

রায়-মহাশয়ের প্রাণ আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিল। পুত্র আপন নিজ-খরচের জন্য যে টাকা পাইয়াছে, তা'র একটী কপর্দ্দকও অপব্যয় করে নাই, অথচ সেই টাকার এরূপভাবে সদ্ব্যয় করিতে চাহে,—পিতার আনন্দের কারণ, এতদপেক্ষা আর কি হইতে পারে? আনন্দ-গদগদ-চিত্তে -মহাশয় উত্তর দিলেন,—“বাবা! এ সংসারের সকল টাকাই তো তোমাদের! তথাপি, তোমার জলপানির টাকাটা এই সৎকার্য্যে ব্যয় করিবে, তোমার যদি সেই সাধই হইয়া থাকে, ভাল, তাহাই হইবে। তবে তোমার যখন নিজ-খরচের জন্য কোনও টাকার দরকার হইবে, সরকারী তহবিল হইতে তুমি ঐ টাকার দশ গুণ টাকা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। তজ্জন্য তোমায় কখনও কোনও কৈফিয়তের দায়ী হইতে হইবে না। তোমার সদিচ্ছার পুরস্কার-স্বরূপ তোমার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা বিহিত করিলাম।”

হরদয়াল এইবার আর এক নূতন সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—“তাই তো! এ ব্যাপারখানা আবার কি? আমি কি এ স্বপ্ন দেখিতেছি?” তখন আপনা-আপনিই তাঁহার প্রাণের ভিতর ধ্বনিত হইল,—“বুঝিলাম না,—রায়-মহাশয় কৃপণ—কি দয়ার আধার দ্বিতীয় দাতাকর্ণ?”

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসায়, সে দিনের বৈঠক সেই অবস্থাতেই ভঙ্গ হয়। সুতরাং সেদিন আর কোনও বিশেষ পরামর্শের অবসর হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন, সেই অপরাহ্ণে, সেই বৈঠকখানায়, সেই ভাবে রায়-মহাশয় বসিয়া আছেন। ভৃত্য রামদাস ফুঁ দিয়া কলিকার আগুনটা জমকাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছে। পণ্ডিত রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ, শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বুঝাইতেছেন,—"এ সংসারের সারবাক্য—শ্রীহরির নাম গুণানুকীর্ত্তন। যতই ললিতপদবিন্যাসযুক্ত হউক, সে বাক্য বাক্যই নহে,—যে বাক্যে শ্রীহরির জগৎ-পবিত্রকারী নাম-যশ কীর্ত্তিত না হয়।" ভাগবতভূষণ মহাশয়ের মূর্ত্তিখানি বড়ই মনোহর। তাঁহার গৌর-বরণ নধর-গঠন দেহখানি দর্শন করিলে, স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার ভক্তগণ বলিয়া থাকেন,—'মূর্ত্তিমান শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাতে যেন সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন।' নিন্দকগণ উত্তর দেন,—'ভাগবতভূষণ প্রত্যহ সওয়া পাঁচ সের খাঁটি দুগ্ধ ও আড়াই সের 'রাতাবি' সন্দেশ আহার করেন, তাই তাঁহার এতাদৃশ কান্তি-পুষ্টি!' ভাগবত-ভূষণ মহাশয়ের মস্তকে গরদের পাগড়ী, গায়ে গরদের চাদর, পরিধানে গরদের সুন্দর বস্ত্র। তাঁহার ললাটে চন্দনের তিলকরেখা, গণ্ডদেশে বিষ্ণুপদ-চিহ্ন। ভাগবত-ভূষণ মহাশয় একাগ্রচিত্তে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন, আর ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া, ব্যাখ্যা-সহকারে বুঝাইতে লাগিলেন,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।

তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥"

অর্থাৎ,—"অতি বিচিত্র পদবিন্যাসসত্ত্বেও যে বাক্যের কোন স্থানে জগত-পাবন শ্রীহরির যশ কীর্ত্তিত হয় নাই; সুধীজনগণ তাহাকে কাকতীর্থস্বরূপ—কাকতুল্য কামিগণের বিহার স্থান—বলিয়া মনে করেন। কমনীয় পদ্মখণ্ড-নিবাসী মানসসরোবরবিহারী রাজহংসগণের ন্যায় কমনীয় ব্রহ্মানন্দবিলাসী

সত্ত্বপ্রধানচেতা পরমহংসগণ কদাচ উহাতে নিরত হয়েন না। অর্থাৎ, সুনির্ম্মল মানসসরোবরবিহারী রাজহংসগণ যেমন বায়স-সেবিত পরিত্যক্ত-বিচিত্র-অন্নাদি-যুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া কমলবনেই বিহার করিয়া থাকে; সত্ত্ব-গুণাবলম্বী সাধুগণও সেইরূপ, বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইলেও হরিকথাবিহীন বাক্যে কদাপি মনোভিনিবেশ করেন না; তাঁহারা সুপবিত্র হরিকথামৃত পানেই নিয়ত নিরত থাকেন।”

ভাগবতভূষণ মহাশয়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় দেওয়ানজীকে সঙ্গে লইয়া হরিনারায়ণ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইলে, রায়-মহাশয় উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেমন! সংবাদ মঙ্গল তো?”

হরিনারায়ণ উত্তর দিলেন,—“আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল। ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। ৪ঠা মাঘ দিন ধার্য্য হইয়াছে। দেওয়ানজী মহাশয় ও আমি দুই জনে উপস্থিত থাকিয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিব,—সেইরূপই ব্যবস্থা হইয়াছে।”

রায়-মহাশয়।—“খরচ-পত্রের বিষয় বিশেষ কিছু অনুমান করিয়াছ কি?”

হরিনারায়ণ।—“বোধ হয় হাজারের উপর আরও কিছু বেশী পড়িতে পারে।”

দেওয়ানজী বাধা দিয়া কহিলেন,—“সে ভাবনা না ভাবাই ভাল। যাহা দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এ সময়ে আর খরচ-পত্র বাড়ান কর্ত্তব্য নহে।”

রায়-মহাশয় উত্তর দিলেন,—“যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়,—ইহাই আমার অভিলাষ। সামান্যের জন্য ব্রাহ্মণ আবার কাহার দ্বারস্থ হইতে যাইবেন? তাঁহার দায় উদ্ধারে যখন স্বীকার হইয়াছি, কিছু বেশীই লাগুক, আর কমই লাগুক, তদ্বিষয়ে ভাবিবার প্রয়োজন নাই।”

প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য বিষয়-কর্মের কথাও দুই চারিটা উপস্থিত হইল। দেওয়ানজী ও হরিনারায়ণ তৎসম্পর্কে যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর রায়-মহাশয় কহিলেন,—"ভাগবতভূষণ মহাশয়কে আনাইয়াছি। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম,—আমার স্থাপত্য গ্রহণে অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় পড়িতে পারে।"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"সম্মুখে লাটের কিস্তি আছে। দুই চারিটা খুচরা খরচও যে নাই, তাহা নহে। বিশেষতঃ এবার যেরূপ দুর্বৎসর দেখা যাইতেছে, তাহাতে আদায়-পত্র যেমন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় এত টাকা ব্যয় করা, আমার মতে যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না।"

ভাগবতভূষণ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তর দিলেন,—"কর্ত্তা শুভকার্য্য মনন করিয়াছেন। এ কার্য্যে বাধা দেওয়ায় প্রত্যবায় আছে।" এই বলিয়া ভাগবতভূষণ মহাশয়, পরিপোষক একটী শাস্ত্র-বাক্য আবৃত্তি করিলেন।

দেওয়ানজী।—'কর্ত্তার ইচ্ছায় বাধা দিব, সে সাধ্য আমার কি আছে? তবে আমার মত এই,—আপাততঃ কিছু দিনের জন্য এই গুরুব্যয় স্থগিত রাখিলে ভাল হইত।"

দেওয়ানজীর উত্তরে রামদাস বড়ই বিরক্ত হইল। প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে সাহস করিল না; কিন্তু মনে মনে বলিতে লাগিল,—"দেওয়ানজী মহাশয়ের ঐ এক কি স্বভাব! কোনরূপ খরচ-পত্রের কথা উঠিলে, দেওয়ানজী মহাশয় প্রথমেই 'আড়' হইয়া পড়েন।" মনে মনে এই কথা বলিয়া, রাগে 'গিসগিস' করিতে করিতে রামদাস বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেল।

দেওয়ানজী মহাশয়ের কথার উত্তরে ভাগবতভূষণ মহাশয় পুনরপি কহিলেন,—"শুভকর্ম্ম স্থগিত রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" ভাগবতভূষণ মহাশয় শাস্ত্রোক্তি এবং প্রবাদবচনসমূহ উল্লেখ করিয়া শুভকার্য্য স্থগিত রাখা সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

কর্ত্তা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। ভাগবতভূষণ মহাশয় ও দেওয়ানজীর

কথাবার্ত্তা শুনিয়া, পুত্র হরিনারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হরিনারায়ণ! এবিষয়ে তোমার মত কি? দেওয়ানজী মহাশয় যাহা বলিলেন, সকলই তো শুনিলে! এ অবস্থায় এত টাকা ব্যয় করিতে তোমরা সমর্থ হইবে কি?"

পিতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাব অনুভব করিয়া, হরিনারায়ণ উত্তর দিলেন,—"আপনি যে কার্য্য মনন করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন করিতে হইবে। টাকার সচ্ছলতা কোন্ কালেই বা বেশী হইবে,—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। তবে কখনও কোনও দায় উপস্থিত হইলে, আপনার আশীর্ব্বাদে তাহাতে আটক থাইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

ভাগবতভূষণ মহাশয় আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া হরিনারায়ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাবা! চিরজীবী হও। যথার্থই তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র।"

রায়-মহাশয় পুনরপি দেওয়ানজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দেওয়ানজী মহাশয়! আপনার কি সম্পূর্ণই অমত? কোনও প্রকারে কি টাকার কুলান করা যাইবে না?"

দেওয়ানজী মহাশয় এইবার বুঝিলেন, কর্ত্তার সম্পূর্ণ অভিপ্রায়;—সুতরাং বাদানুবাদ বিড়ম্বনা মাত্র। দেওয়ানজী মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার চেষ্টার তো আমি আর ত্রুটি করিলাম না! ওঁর টাকা, উনি যদি এখন লুটিয়ে দেন, আমি কি করিতে পারি? আমার তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধিই বা কি আছে? তবে ভবিষ্যতে দোষ দিতে না পারেন, এই জন্যই সাবধান করতে হয়।" প্রকাশ্যে উত্তর দিলেন,—"ভাল, তাহাই হউক। এখন কি কি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহার আদেশ করুন।"

রায়-মহাশয় কহিলেন,—"আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমার শীতবস্ত্র গ্রহণ উপলক্ষে প্রকৃত শীতার্ত্ত কতকগুলি দীন-দরিদ্রকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রথমতঃ—আমার জমিদারীর মধ্যে সন্ধান লইয়া দেখিতে হইবে, শীতবস্ত্রাভাবে কেহ শীতে কষ্ট পাইতেছে কি না। তাহাদের প্রত্যেককে এক-খানি করিয়া শীতবস্ত্র দান,—আমার প্রধান অভিপ্রায়। দ্বিতীয়তঃ,—কলিকাতার

গঙ্গার ধারে এবং কালীঘাটের পথে যে সকল ভিক্ষুক শীতে কাঁপিয়া সারা হয়, তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একখানি শীতবস্ত্র প্রদান করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত, কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে যে সকল গরীব দুঃখী আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইবে, তাহাদের জন্যও যথাবিহিত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিতরণের পূর্ব্বে বা পরে, কোনরূপ আড়ম্বর করা না হয়। প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই সাহায্য-লাভের অধিকারী—ইহাই মনে রাখিয়া ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিতে হইবে।”

দেওয়ানজী—“অপরাপর ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, মনস্থ করিয়াছেন?”

রায়-মহাশয়—“সচরাচর ক্রিয়া-কর্ম্মে যেরূপ কার্য্যের ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে, এবারও তাহাই হইবে। উৎসব ও ব্রাহ্মণাদি বিদায়ের ব্যবস্থা যথাবিহিত স্থির হইয়াছে। তবে আপনাদিগের আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য,—যে সকল শীতবস্ত্র ক্রয় করা হইবে, তাহার একখানিও যেন বৈদেশিক আমদানী বিলাতী বস্ত্র না হয়। মূল্যের সামান্য তারতম্যের জন্য কদাচ বৈদেশিক বস্ত্র লইবেন না।”

এই কথা বলিয়া, কত টাকার কি কি বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়ানজীর হস্তে প্রদান করিলেন। দেওয়ানজী এবং হরিনারায়ণ উভয়ে পরামর্শ করিয়া শীতবস্ত্রাদি ক্রয় করিবেন,—এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইল।

দেওয়ানজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কয় দিনের মধ্যে সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র করিতে হইবে? কবে দিন স্থির হইয়াছে?”

রায়-মহাশয় তখন সভাপণ্ডিত ভাগবতভূষণকে একটী ভাল দিন স্থির করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভাগবতভূষণ মহাশয়, পঞ্জিকা দেখিয়া, নানাবিধ বচন আবৃত্ত পূর্ব্বক কহিলেন,—“আগামী ২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবারই শুভকার্য্যের একমাত্র প্রশস্ত দিন। ঐ দিন শীতবস্ত্র-প্রদানে বিধেয়।”

মধ্যে সাত দিন মাত্র ব্যবধান। দেওয়ানজীর ইচ্ছা,—দিনটা পিছাইয়া দেওয়া হয়। তিনি কহিলেন,—"এত শীঘ্র এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানের যোগাযোগ সম্ভবপর কি? দিনটা কিছু পিছাইয়া দিলে ভাল হইত না?"

ভাগবতভূষণ পুনরায় শাস্ত্রবাক্য আবৃত্ত করিয়া বিলম্বের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিলেন। অগত্যা স্থির হইল,—২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার রায়-মহাশয় শীতবস্ত্র গ্রহণ করিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

২৪এ পৌষ অপরাহ্ণ তিনটার সময়, ঘুম হইতে উঠিয়া, হৃদয়াল বাবু বারান্দায় মুখ ধুইতে আসিয়াছেন। ভৃত্য নদীয়ার চাঁদ, এক হাতে জলপাত্র—একটী কাচের গেলাস এবং অপর হাতে গাত্রমার্জ্জনী—তোয়ালে-খানি লইয়া, দাঁড়াইয়া আছে। বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু নদীয়ার চাঁদের চোখ-দুটী তখনও তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু। সহসা সম্মুখস্থ সদর রাস্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায়, মুখ ধুইবার জলের জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া, বাবু পথের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন; আর তাঁহার পেয়ারের চাকর নদীয়ার চাঁদ, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। বাবু দেখিতেছেন,—বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া অসংখ্য দীনদুঃখী নরনারী লাল-রঙের নূতন বনাত গায়ে দিয়া চলিয়াছে। ভৃত্য নদীয়ার চাঁদ চক্ষু বুজিয়া ভাবিতেছে,—সে যেন বাবুর সঙ্গে এক পরীরাজ্যে উপনীত হইয়াছে। বাবু দেখিতেছেন,—দরিদ্র শিরোরত্ন প্রভৃতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নূতন নূতন শাল গায়ে দিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চলিয়াছেন। নদীয়ার চাঁদ স্বপ্ন দেখিতেছে,—পরীরাজ্যের পরীরা যেন তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছে। বাবু ভাবিতেছেন,—"এমন দাতা কে আছেন?" নদীয়ার চাঁদ ভাবিতেছে,—"তুচ্ছ নকরী—তুচ্ছ তাঁবেদারী।"

বাবু ডাকিলেন,—"নদের চাঁদ!"

ধমক খাওয়ায়, নদীয়ার চাঁদের হাত হইতে জলপাত্র পড়িয়া গেল। তরঙ্গবৰণ কাচের গেলাস, ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ শব্দে খণ্ডবিখণ্ড হইল। নদীয়ার চাঁদ, অপ্রতিভ হইয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। সে যেন প্রথমে ভাবিয়াছিল,—পরীরাজ্যে পরী-সঙ্গে রসরঙ্গে তাহার হস্তপদ সঞ্চালিত হইয়াছে। কিন্তু এখন দেখিল,—কোন্ বনে কোন্ বাঘ বিরাজ করিতেছে।

বাবু রোষভাবে কহিলেন,—"বেটা যেন একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য!" নদীয়ার চাঁদের মুখখানা 'কাঁচু-মাচু' হইল; সে যেন একটু আদুরে-আদুরে কান্না-কান্নাভাব প্রকাশ করিল। তাহার মুখপানে চাহিয়া বাবু বলিলেন,—"যা,—যা হয়েছে, যা! একবার মুখুজ্যে মশায়কে ডেকে দে।" মুখুজ্যে মহাশয়, বাবুর বাড়ীর গোমস্তা।

নদীয়ার চাঁদ হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল; ভাবিল,—"ফাঁড়াটা অল্পে অল্পেই আজ কেটে গেল।" এরূপ অবস্থায়, অন্যে এই অপকর্ম্মটা করিয়া বসিলে, তাহার কি শাস্তি হইত, বলা যায় না। কিন্তু নদীয়ার চাঁদ বাবুর পেয়ারের চাকর; তাই তাহার সকল অপরাধ এক কথায় কাটিয়া গেল। নদীয়ার চাঁদ দেখিতে—ফিটফাট গৌরবর্ণ;—বয়ঃক্রম ষোল সতের বৎসর; মাথার চুলগুলি বেশ কাটা-ছাটা; পরণ পরিচ্ছদ ভব্যযুক্ত; জাতিতেও সে জল-আচরণীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। দেখিলে—তাহাকে ভদ্র-ঘরের ছেলে বলিয়া মনে হয়। বাবুর বিশ্বাস, তেমন চাকর সচরাচর সহরে মেলাই ভার!

মুখুজ্যে মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখুজ্যে মশায়! দলে দলে ঐ যে কাঙ্গালীরা লাল-বনাত গায়ে দিয়া চলিয়াছে, আপনি বলিতে পারেন কি, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে?"

মুখুজ্যে মহাশয় উত্তর দিলেন,—"কেন!—আপনি জানেন না কি? রায় মহাশয় আজ যে শীতবস্ত্র গ্রহণ করেছেন? হরিনারায়ণ বাবুর সঙ্গে কি

তখন আপনার দেখা হয় নাই? তিনি যে আপনাকে আজ যেতে বলে গিয়েছেন?”

বাবুর প্রাণের ভিতরটা যেন 'কেমন-কেমন' করিয়া উঠিল। তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন,—“হাঁ! তাই বটে!—তাই বটে!” মনে-মনেও কহিলেন,—“হাঁ! তাই বটে!” তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—“তাই সেদিন পদ্মাস্নানে যা'বার সময় শীতবস্ত্র-ব্যবহারের অনুরোধে রায়-মহাশয় অত সামর্থ্যাসামর্থ্যের কথা তুলেছিলেন!”

অতঃপর হরদয়াল বাবু, রায়-মহাশয়ের বাড়ী যাইবার অভিপ্রায়ে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

* * *

রায়-মহাশয় আজ শীতবস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য দিন তাঁহার গায়ে কখনও কখনও একটী ফিতা বাঁধা 'বেনিয়ান জামা' এবং একখানি চাদর মাত্র দেখা যাইত। হরদয়াল ভাবিয়াছিলেন,—“না-জানি রায়-মহাশয় আজ কি শীতবস্ত্রই গ্রহণ করিবেন! যে শীতবস্ত্র-গ্রহণের এত আড়ম্বর, না-জানি তাহা কি অপরূপই হইবে!” কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। তিনি যে আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন,—রায়-মহাশয়ের গায়ের 'বেনিয়ান' জামা ও চাদরখানির উপর লাল রঙের নূতন একখানি বনাত উঠিয়াছে। আরও, রায়-মহাশয়ের বাড়ীর চারিদিকে হরদয়াল যতই চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন;—কোথাও কাঙ্গালী-বিদায়ের হুড়াহুড়ি, কোথাও ভোজ্য দ্রব্যাদির ছড়াছড়ি, কোথাও স্তূপাকারে পাত্রবস্ত্রাদি—এই সকল দৃশ্য একে একে যতই তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল; ততই তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না;—ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—একখানি সামান্য বনাত মাত্র গায়ে দিবার জন্য রায়-মহাশয় কি সমারোহেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন! তিনি আপনাকে আপনি বিকাইয়া দিয়া

কহিতে লাগিলেন,—"আমি মূঢ়, আমি ভ্রান্ত, তাই এই দেবস্বভাব মহাপুরুষের সহিত শীতবস্ত্র-গ্রহণ-ব্যপদেশে কৌতুক করিতে গিয়াছিলাম।" এতাদৃশ বিস্ময়-বিহ্বল-হৃদয়ে তিনি যখন রায়-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, আবেগে তাঁহার অন্তরস্থ চিন্তাস্রোত আপনা-আপনিই যেন প্রবহমান হইল। হরদয়াল গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—"সার্থক আপনার শীতবস্ত্রগ্রহণ! আপনিই ধন্য—আপনিই ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য!"

রায়-মহাশয়, হরদয়ালের উদ্দীপনা শান্ত করিয়া, ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"বাবা হরদয়াল! তুমি অকারণ কেন আমায় এত সাধুবাদ করিতেছ? এই শীতবস্ত্র-গ্রহণ-ব্যাপারে, কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা ভিন্ন আমি এমন কোনই প্রশংসার্হ কাজ করি নাই,—যাহার জন্য তুমি আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছ। আমাদের হিন্দুর ধর্ম্মই এইরূপ। কেবল শীতবস্ত্র গ্রহণ বলিয়া নহে; হিন্দু যখনই যে কোন তৃপ্তিপ্রদ সামগ্রী ব্যবহার করেন, তাঁহাকে তখনই তাহা দেবতা-ব্রাহ্মণে ও সর্ব্বভূতে অর্পণ করিতে হয়। এ অনুষ্ঠান, হিন্দুর প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। কলির প্রভাবে যদিও দিন দিন হিন্দুর এই সনাতন প্রথা লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এ কর্ত্তব্য-পালন এখনও সম্পূর্ণরূপে যে লোপ পাইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আমরা সারাচর দেখিতে পাই,—কোনও একটা নূতন ফল উঠিলে, হিন্দু অগ্রে দেবতা-ব্রাহ্মণের সেবায় তাহা উৎসর্গ করে, গরীব-দুঃখীকে দেয়, পরে পুত্র-পরিজন ও আপনি খাইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে এ দৃষ্টান্ত ভূয়োভূয়ঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোক সম্পর্কেই হিন্দুর এই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। হিন্দু তর্পণ করে—আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী বিদেশী, শত্রু মিত্র, যে যেখানে আছে, সর্ব্বভূতের সদাত্মার মঙ্গল-কামনা করিয়া। হিন্দু গয়াধামে গিয়া প্রেতাত্মার পিণ্ড দান করে,—তাহাতেও পিতা-পিতামহ আত্মীয়-অন্তরঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বভূতের সর্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণ-কামনায় অনুপ্রাণিত হয়। হিন্দুর ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—হিন্দুর ইহাই শ্রেয়োধর্ম্ম। নিশ্চয় জানিও, আমার এই শীতবস্ত্র-গ্রহণ—

সেই কর্ত্তব্য-পালন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমি বহুমূল্য শীতবস্ত্রে সুখানুভব করিব, আমার ঘরে স্তূপে স্তূপে শীতবস্ত্র পচিয়া পোকায় কাটিয়া নষ্ট হইবে; আর আমার আশেপাশে চারিদিকে শীতক্লিষ্ট দীন-দুঃখীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে শুনিয়াও বিচলিত হইব না,—ইহাই কি ধর্ম্ম? কাহারও বাড়ীর ভোক্ত্য ভোজ্য নর্দ্দামা দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে, শেয়াল-কুকুরেও খাইতেছে না; আর কোথাও একমুষ্টি অন্নের জন্য বুভুক্ষু ব্যক্তিগণ হাহাকার করিতেছে, অনাহারে মরিতেছে, কেহ চাহিয়াও দেখিতেছে না;— ইহাই কি ধর্ম্ম? এই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার গুরুদেব প্রায়ই বলিতেন,—'সংসারে সকলকেই যে আপনার বলিয়া জ্ঞান করে,— সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক।' আমরা তো নরকের কীট; আমরা আর কতটুকু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ?"

গুরুদেবের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুণ্যময় স্মৃতি রায়-মহাশয়ের মনোমধ্যে জাগরিত হওয়ায়, তাঁহার প্রাণ যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে আপ্লুত হইল। মনে মনে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে প্রণতিপূর্ব্বক তিনি ভাব-গদগদস্বরে কহিলেন,—"গুরুদেব বলিতেন, 'এ সংসারে আপনার গণ্ডীটা একটু বাড়াইবার চেষ্টা করিও; কেবল আপনিটি, আর পরিবারটি নিয়ে, আপনার-জনের গণ্ডী স্থির করা কর্ত্তব্য নহে।' তিনি আরও কহিতেন,—'আত্মসুখ অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার পরের কষ্টের প্রতি চাহিয়া দেখিও; আপনার কষ্ট নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমতে পরের কষ্ট নিবারণ পক্ষে চেষ্টা করিও; ভগবান বল-বুদ্ধি-ভরসা দিবেন।' হরদয়াল! তোমাকেও আমি গুরুদেবের এই কথাটি স্মরণ রাখিতে বলি। তুমি যেমন আমায় শীতবস্ত্র-গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলে, তোমার প্রতি আমারও তদ্রূপ এই অনুরোধ,—পরের প্রতি এক একবার চাহিয়া দেখিও। তুমি বিপুল সম্পত্তির অধিপতি; তুমি ইচ্ছা করিলে, সংসারের অনেক কষ্ট লাঘব করিতে পারিবে। কিছু মনে করিও না; তুমি আমায় বড়ই স্নেহভাজন, বিশেষতঃ তোমার

মনে কৌতুহলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছি ;—তাই তোমায় এত কথা কহিতে সাহসী হইলাম।”

হরদয়াল একাগ্রমনে রায়-মহাশয়ের বাক্য-সুধা পান করিতেছিলেন ; আর মনে মনে বলিতেছিলেন,—“ভগবান্ !—আমায় বলবুদ্ধি ভরসা দেও।—কি করিলে আমি এমনটী হইতে পারিব ?”

কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণী রান্না-ঘরের শিকল খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছেন; এমন সময় ঘরের দক্ষিণ-দিকের 'কোলাঙ্গা' হইতে একটা বিড়াল লাফাইয়া পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"সব মাছ খেয়ে গেল—সব মাছ খেয়ে গেল।" চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দেশে ভর্ৎসনা আরম্ভ করিয়া দিলেন; আপন-মনে রাগের ভরে বলিতে লাগিলেন,—"কেমন সব কাজের ছিরি! সংসারের কোনদিকেই কারো লক্ষ্য নাই। দরজাটা দিয়েছে, তাও চোখ মেলে দেখে দেয় নাই। ঘরে বিড়াল রইল,—সেটাও কি কারো নজরে প'ড়লো না? দু'জনই সমান!" বলা বাহুল্য, পুত্রবধূ ও কন্যাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই সকল কহিতেছিলেন। ইত্যবসরে বিড়ালটা ছুটিয়া পলাইল। তখন তিনি বিড়ালের পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘরের ভিতর আর তাঁহার প্রবেশ করা হইল না; এমন সময়ই বামা-পিসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর পাশেই বামা পিসীর খোলার ঘর। যাহার বাড়ীতে যে কথা লইয়াই গণ্ডগোল আরম্ভ হউক, বামা-পিসী তথায় উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। কোনও গণ্ডগোল আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, বাঘের পাছের ফেউয়ের মত, বামা-পিসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হন।

বামা-পিসী বিধবা। ছেলে বেলায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তখন তাঁহার বাপ-মা আদর করিয়া তাঁহার গায়ের গহনা-পত্র খুলিতে দেন নাই। এখন বামা-পিসীর বয়স চল্লিশের কোটা পার হইয়াছে; কিন্তু বামা-পিসী

এখনও হাতের সে বালা-অনন্ত ত্যাগ করেন নাই; পেড়ে কাপড় পরিতেও তিনি দ্বিধা মনে করেন না। পরণ-পরিচ্ছদের বিষয়ে কেহ কখনও কোনও প্রশ্ন করিলে; বামা-পিসী উত্তর দিয়া থাকেন,—"গুরুজনের আদেশ! আমি কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারি? আর ক'দিনই বা বাঁচবো!—শেষকালে তাঁদের আদেশে অবহেলা ক'রে নরকের পথটা আর প্রশস্ত করি কেন!" বামা-পিসীর এতাদৃশ অকাট্য যুক্তিজালেও ফুলোকের কুরটনা কিন্তু এখনও আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই; তাহারা বলে,—"বামা পিসী কেবল পরণ-পরিচ্ছদে আহারে-বিহারেই গুরুজনের কথা মানিয়া চলেন!" ফলতঃ, তাঁহার চাল-চলন দেখিয়া, পাড়ার নব্যগণ কিন্তু এখনও বুঝিতে পারেন না,—বামা-পিসী সধবা কি বিধবা!

বামা-পিসীর গড়নখানি গোলগাল, খর্ব্বাকৃতি বালিকা বয়সে বিধবা হওয়ার পর, পিতামাতার আদরযত্নে ভাল-মন্দ খাইয়া পরিয়া, বামা-পিসীর চেহারাখানা এমনই গোলগাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থই যেন অধিক হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যে কয়েক মাস বাত-পৈত্তিকের ব্যায়রামে ভুগিয়া শরীরটা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, বামা-পিসী প্রায়ই দুঃখ করিয়া থাকেন। সাক্ষাতে অনেকেই তাঁহার সে কথায় সায় দেন বটে; কিন্তু পরোক্ষে সকলেই কাণাকাণি করেন,—"বামা-পিসীর আয়তন দিন দিনই যেন বাড়িতেছে;—তিনটা বাঘেও তাঁহার কিছু করিতে পারে না।" বামা-পিসীর গড়নটাও যেমন; রঙ্‌টাও তদনুরূপ;—সোনায় সোহাগা আর কি? বামা-পিসীর রূপ-বর্ণনায় এ পর্য্যন্ত অনেক কবিই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রঙের মহিমা এ পর্য্যন্ত কেহই কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। সে রঙ্‌টী যে কেমন, তাহা কি করিয়াই বা বর্ণনা করা যায়? সে রঙ—বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি! ঠিক কেলেহাঁড়ির তলার মতও নয়, আবার কটাশে-রঙের পাঁঠাটার মতও নয়; মাজা-ঘসার মাঝামাঝি কেমন যেন একটা চেক্‌নাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি

কৃষ্ণাঙ্গীও নন, শ্যামাঙ্গীও নন; আবার গৌরাঙ্গী বলিলেও তাঁহার রূপের স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না। তবে বামা-পিসীর কিন্তু মনে মনে অহঙ্কার,—তাঁহার মত রূপসী সচরাচর বামন-কায়েতের ঘরেও জন্মায় না। বলা বাহুল্য, বামা-পিসী সদ্গোপ-কন্যা।

বামা-পিসীর বাপ-মা, অনেক দিন হইল, পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র ভাই;—তিনিও এখন চাকরী-উপলক্ষে সপরিবারে বিদেশে বাস করেন। সুতরাং বামা-পিসী এখন আপন সংসারের সর্ব্বে সর্ব্বা—'একমেবা দ্বিতীয়ম্'। বামা-পিসীর নাম-করণ-সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে 'সুন্দরী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পাড়ার অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে বামাসুন্দরী বলিয়াই জানিত। পাড়া-সম্পর্কে সম্পর্কিত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল; সেই তাঁহাকে প্রথমে 'বামা-পিসী' বলিয়া ডাকিত। সেই দেখা-দেখি, পাড়ার ছেলে-পিলেরাও তাঁহাকে 'বামা-পিসী' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। তদবধি 'বামা-পিসী' এই নামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কোন্‌কালে ছিল, তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার নামটিতে সে পরিচয় আজিও বিরাজমান রহিয়াছে। তালগাছ নাই; কিন্তু তালপুকুর নাম আজিও অব্যাহত।

অনলের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পবনদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণীর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বামা-পিসী আসিয়াও তদ্রূপ যোগদান করিলেন। বামা-পিসী উপস্থিত হইলেই, কর্ত্তৃঠাকুরাণী একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বামা-পিসী আগবাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, দিদি-ঠাকরুণ! কি হয়েছে গা! অত বক্‌ছিলেন কাকে?"

যেন অনলে ইন্ধন সংযোগ হইল। কর্ত্তৃঠাকুরাণী কহিলেন,—"বক্‌ছিলুম আর কি,—এই রান্নাঘর থেকে মাছগুলো সব বেড়ালে খেয়ে গেলো, তাই বল্‌ছিলুম!"

বামা-পিসী অধিকতর আগ্রহ-প্রকাশে কহিলেন,—"আহা-হা! বেড়ালে

মাছগুলো খেয়ে গেল! তা' কেউ চেয়ে দেখলে না? রান্নাঘরের দরজা কি খোলা ছিল দিদি? বেড়াল ঢুক্‌লো কি করে ঘরে? আহা-হা! অতগুলো মাছ—সব খেয়ে গেল!"

বামা-পিসীর সহানুভূতি-ঘৃত-প্রক্ষেপে কর্ত্তঠাকুরাণীর প্রাণটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। মনের আবেগে তিনি কহিয়া ফেলিলেন,—"বল্‌বো কি দুঃখের কথা! মাছ রেখে শিকল দিলেম;—কিন্তু কেউ একবার চেয়ে দেখলেন না যে, ঘরে বেড়াল ছিল! সুরেশ আমার ভালবাসে বলে, সাত আনা দিয়ে একটা খোকা-ইলিশ কিনে রেখেছিলাম! অমন মাছটা বেড়ালে খেয়ে গেল!"

সুরে সুর মিলাইয়া বামা পিসী কহিলেন,—"আহা-হা! অমন মাছটা বেড়ালে খেয়ে গেল! তা দিদি!—না বলেও আর থাকা যায় না! বলি—বাড়ীর সবাই কি চোখের মাথা খেয়ে ছিলেন! কেউ একবার চেয়ে দেখতে পার্‌লেন না? ভাল! যা হোক, তোমাদের বাড়ীর ঝি-বৌরা!"

কর্ত্তঠাকুরাণী দুঃখে দ্রব হইয়া কহিলেন,—"কারুকে কি কিছু বল্‌বার যো আছে? যেমন বৌ, তেমনি ঝি! আমার অদৃষ্টগুণে দুই-ই সমান! বউকে একটা কথা বল্‌লে, তিনি অমনি ফোঁস্ করে ওঠেন; ঝিকে কিছু বল্‌তে গেলে, তিনি তো কেঁদেই আকুল হন। আজকালকার মেয়েদের কি কিছু বলে পার পাবার যো আছে? আমার হয়েছে যেন সাঁকার করাত!"

পুত্রবধূ ও কন্যা অন্তরালে থাকিয়া সকলই শুনিতেছিলেন। কিন্তু আর তাঁহাদের সহ্য হইল না। তাঁহারাও দুই ঘর হইতে দুই জনে এইবার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তর প্রত্যুত্তরে শেষে একটা কোন্দল বাধিয়া উঠিল। পুত্রবধূ বলিয়া উঠিলেন,—"বেড়াল ঘরে রেখে যে দরজা দিয়েছে, সে চোখের মাথা খাক।" শাশুড়ীও বলিলেন,—"বেড়াল ঘরে রেখে যে দরজা দিয়েছে, সে চোখের মাথা খাক্!" কন্যাও কহিলেন,—"বেড়াল ঘরে রেখে যে দরজা দিয়েছে, সে চোখের মাথা খাক।"

বামা-পিসী মাঝে মাঝে কেবল রসান দিতেছিলেন। এইবার বলিয়া উঠি-

লেন,—"দেখেছ আস্পৰ্দ্ধার কথা! আমার বাড়ী হলে, আমি খেংরাপেটা করে সবাইকেই বাড়ী থেকে দূর করে দিতেম। ওমা! কি লজ্জা!—কি ঘৃণা! দোষও কর্‌বে, আবার চোখও রাঙাবে!"

এই বলিতে বলিতে রাগে গগগর করিয়া, কোমর দুলাইতে দুলাইতে, বামা-পিসী সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

বাড়ীর কেহই আর সে রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। সে রান্না-ঘর সেইভাবেই পড়িয়া রহিল। অতঃপর রাত্রি নয়টার সময়, সুরেশ বাবুকে সদরের দরজা খুলিয়া দিতে গিয়া, ঝি সেই রান্নাঘরের শিকল আট্‌কাইয়া দিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আফিসের ফেরতা সুরেশচন্দ্র ভবানীপুরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বাড়ী আসিয়াই সুরেশ বাবু বড় বিপদে পড়িলেন। কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু দেখিলেন—এক দিকে জননীর নয়নে জলধারা বহিতেছে; এক দিকে ভগ্নী কাঁদিয়া আকুল; এক দিকে স্ত্রী বাঁকিয়া বসিয়া আছেন। ব্যাপারখানা কি,—হয়েছে কি? কৈ,—বাড়ীর কেউ সে কথা খুলিয়া বলে না। মার কাছে গেলেন; মা কহিলেন,—"বুড়া বয়সে শেষ-কালে আমার অদৃষ্টে এই ছিল! বৌ-য়ের লাথি-ঝাঁটা খেতে হল!" ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ভগ্নী কহিলেন,—"অনাথা অভাগা আমি—নইলে আমাকেই লোকে যাচ্ছেতাই কর্‌বে কেন? যেমন অদৃষ্ট আমার—তাই শ্বশুরকুলেরও মাথা খেয়ে বসে আছি!" এই বলিয়া, ভগিনী আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন;—যেন কতই পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। অবশেষে সুরেশচন্দ্র, স্ত্রীর নিকট কারণ-জিজ্ঞাসু হইলেন।

কিন্তু স্ত্রীও সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, রোষভরে কহিলেন,—"আমায় এখনই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও! এ লাঞ্ছনা এ গঞ্জনা আর আমার সহ্য হয় না।"

সুরেশ বাবু সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"কি হয়েছে, আগে আমায় বল! শুধু শুধু অমন করলে চল্‌বে কেন?" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র স্ত্রীর হাত ধরিয়া আদর করিতে গেলেন। ঘনমেঘে থর-বর্ষণ আরম্ভ হইল।

স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"কেন আমার বাপ-ভাই কি আমায় এক-মুঠো খেতে দিতে পারে না—যে তার জন্য নিত্যি নিত্যি আমায় এ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে? তোমায় এখনও ব'লছি,—তুমি আজই আমার বাপের বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার কাজ নেই আর শ্বশুর-বাড়ীর ভাত খেয়ে।" এই বলিতে বলিতে ক্রন্দনের সুর ক্রমে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল।

স্বামী আদর করিয়া কহিলেন,—"এত কাঁদ্‌ছো কেন, তুমি? আগে আমায় বল, কি হ'য়েছে; তার পর যা ক'র্‌তে হয়, অবশ্যই ক'রব।" সুরেশ বাবু বাড়ীতে প্রবেশ-মাত্র ঝির নিকট এক প্রস্ত মোটামুটি কথাটা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। স্ত্রীর নিকট উত্তর পাইতে বিলম্ব দেখিয়া, তিনি পুনরায় কহিলেন,—"কে, মা আর তোমায় এমন কথা কি ব'লেছেন;—যার জন্য তোমার এত কষ্ট হ'য়েছে? যা শোনা গেল, তাতে তো তোমারই সম্পূর্ণ দোষ ব'লে মনে হয়।"

"ঘটে—ঘটে! তা তো ব'লবেই এখন! হাজার হোক, আমি তোমাদের পর বৈ ত নয়! পরের দোষ ছাড়া, আপনার দোষ কি কেউ কখনও দেখতে পায়? তা—আচ্ছা, আমারই দোষ।—সব আমারই দোষ! তবে এ দোষী মানুষকে তোমাদের নির্দ্দোষী সংসারে আর রাখা কেন? আমি এখনও বল্‌ছি, আজই আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি খুব খেয়েছি শ্বশুর-বাড়ীর ভাত!"

সুরেশ বাবু যতই বুঝাইতে যান, স্ত্রী ততই চটিয়া উঠেন—ততই ক্রন্দনের মাত্রা বাড়াইয়া তোলেন—ততই রূঢ় কথায় ভৎ'সনা করেন। শেষ এমন পর্য্যন্ত বলিলেন,—"যদি আমায় আজই না পাঠিয়ে দেও, এর ফল আমি তোমাদের হাতে হাতে দেব। দেখ্‌তে পাবে, আমি কেমন রামশঙ্কর বাঁড়ুয্যের মেয়ে! তোমাদের সকলকে কাঁদাব, তবে আমি এ বাড়ী থেকে যাবো!"

বাড়ীর সকলেরই এক ভাব। তিনটী মানুষের তিন জন তিন রকম কথা কহিতে লাগিলেন। অথচ, আসল কথাটা যে কি, তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। ঝি, ঝগড়ার কথাটা কিছু বলিয়াছিল; কিন্তু ঝগড়ার কারণটা যে কি,—তাহা কিছুই খুলিয়া বলে নাই। সুতরাং সুরেশ বাবু যে আঁধারে, সেই আঁধারে পড়িয়াই হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যেমন তেমন করিয়া রাত্রিটা কাটিয়া গেল। কিন্তু জঞ্জাল মিটিল কৈ? প্রাতেও সকলেরই সেইরূপ মুখ-ভার। ভগ্নী আর রাঁধিতে যান না; মা আর চাকরাণীকে বাজারে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন না; স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে দু'টোকে খাবার বাঁটিয়া দেন না। অবোধ বালক-বালিকা—তাহারা ক্ষুধায় কাঁদিয়া মরে; তাহাদের মা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বলেন,—"তোদের কি আর আপনার কেউ আছে যে, তোরা খেতে পাবি! যদি ঈশ্বর কখনও দিন দেন—বাপের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে তোদিগে দিতে পারি তবেই তোরা পেটপুরে খেতে পাবি। নইলে, এ শত্রুরপুরীতে কে আর তোদের কি খেতে দেবে?"

এইরূপ, ঝি বাজারের পয়সা চাহিতে গেলে, কর্তৃঠাকরাণী কহেন,—"কার সংসার—কে পয়সা দেবে! আমি একটা বাঁদী বই তো নয়!"

বাসী উনান! সে তো ছাই মুখে দিয়াই বসিয়া আছে? কেহ সেদিকে দৃক্‌পাতও করিতেছে না।

নিরীহ সুরেশচন্দ্র কিন্তু দিনের জের দিনেই মিটাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সরল প্রাণ, নৈশ আঁধারের প্রগাঢ়ত্বর সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের অশান্তি-অন্ধকার সব মিশাইয়া দিয়াছিলেন।

অন্য অন্য দিন প্রাতে যেমন তিনি দাসেদের বাড়ী চা খাইতে যান, আজিও তাই গিয়াছিলেন। দুই একটা গল্প-গুজবে, বা খবরের কাগ দেখিতে শুনিতে, বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। তাই তিনি, এইমাত্র, তাড়াতাড়ি বাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই অবাক! এ কি বিশৃঙ্খলা!

এখনও তাঁহার আপিসের ভাত চড়ে নাই। ছেলে-মেয়ে দু'টো এখনও জলখাবার খাইতে পায় নাই। ঝি-চাকরদের এখনও বাজারের পয়সা পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কেন?—কে উত্তর দিবে! যাহা হউক, আপিসের বেলা হইয়াছে দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি ঝিকে একটা আধুলি প্রদান করিলেন, এবং দোকান হইতে কিছু খাবার আনিয়া দিতে বলিলেন। তা ছাড়া, চাকরের হাতেও একটা টাকা দিয়া কহিলেন,—"বাজার থেকে যা যা আনতে হয়, এনে দিগে যা।"

ঝি খাবার আনিয়া দিল। বিড়ালটা তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া লেজ উঁচু করিয়া মিউ-মিউ ডাকিতে লাগিল। সুরেশ বাবু ছেলে-মেয়ে দু'টীকে কাছে ডাকিলেন। কিন্তু তাহাদের মা, তাহাদিগকে 'শত্রুর' কাছে আসিতে দিতে চাহিলেন না। আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহার চোখ রাঙানিতে, তাহারা হতভম্ব হইয়া যেখানকার সেইখানেই বসিয়া রহিল। সুরেশ বাবু তাহাদিগের মুখে খাবার গুঁজিয়া দিতে গেলেন; কিন্তু জননীর ভয়ে, আড়ষ্ট হইয়া, বালক-বালিকাদ্বয় তাহা গলাধঃকরণ করিতে সাহসী হইল না। তিনি

মাকে ডাকিলেন;—মা কাছে আসিলেন না! ভগ্নীকে ডাকিলেন;—ভগ্নীও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টীর এখনও জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে পড়িল না; আর দিনমানের মত না-খাইয়া তিনি আপিস যাইবেন, অথচ কেহই তাঁহাকে একটী মুখের কথাও কহিল না! ইহাতে সুরেশ বাবুর অন্তরে দারুণ অভিমান-অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর আবার পুনঃপুনঃ ডাকিয়া কাহারও সাড়া-শব্দটী পর্য্যন্ত না পাওয়ায়, সে অভিমান-অনলে যেন ক্রোধের ঘৃতাহুতি-সংযোগ হইল। তখন আত্মগ্লানি-রূপ শিখা-বিস্তার করিয়া, হৃদয়ের ভিতর তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অভিমানে, ক্রোধে, আত্মগ্লানিবশে, সুরেশ বাবু সেই খাবারের ঠোঙাটা লইয়া নর্দ্দামার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। রসনার আস্বাদপ্রদ মিষ্টান্নগুলি অতঃপর নর্দ্দামার কীটকুলের রসনাস্বাদ প্রদান করিতে লাগিল। বিড়ালটা ভয় পাইয়া লাঙ্গুল গুটাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

খাবারগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বাড়ীর সকলের উদ্দেশে যথাযোগ্য গালিবর্ষণ করিতে করিতে, সুরেশ বাবু আপিসে চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে আবার একটা নতনতর গণ্ডগোল আরম্ভ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পত্নী বিনোদিনী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। একে তাঁহার প্রতি 'সকলের' এই অত্যাচার, তাহার উপর আবার আপিসে যাইবার সময় স্বামী সুরেশচন্দ্রের তীব্র ভর্ৎসনা! একি সহ্য হয় গা! এতে কি মরামানুষেরও শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না? তিনি তখনই ঝিকে ডাকিয়া কহিলেন—"ঝি! তুই এখনই গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়! এ বাড়ীর জলগ্রহণ করছি না আর আজ থেকে!

যা—তুই এখনই যা—গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়! এত অপমান! কেন—আমার তিন কুলে কি কেউ নেই যে, এত ঝাঁটা-লাথি খেয়ে পড়ে থাকতে হবে?"।

ঝি সান্ত্বনা করিবার জন্য ধীরে ধীরে কহিল,—"তা যাবেন, মা ঠাকরুণ!—বিকেল বেলায় যাবেন! ভর দুপুর-বেলায়, না খেয়ে না দেয়ে, এমন অবস্থায় কোথাও যেতে আছে কি? গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে!"

বিনোদিনী, মুখটা বাঁকাইয়া, হাত দু'খানা নাড়িয়া, উত্তর দিলেন,—"আরে আমার গেরস্ত রে! এমন গেরস্ত থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? এ গেরস্ত শিগ্‌গির রসাতলে যাক্!—শিগ্‌গির রসাতলে যাক্!"

এই বলিয়া, গৃহস্থের উদ্দেশে যথা-ইচ্ছা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া, বিনোদিনী সদর্পে কহিলেন,—"আমি কিছুই শুন্‌তে চাইনে; তুই গাড়ী ডেকে এনে দিবি কি না—তা বল!"

"সংসার রসাতলে যাক্"—এই কথা শুনিয়া, ঝি একটু থতমত খাইয়াছিল। সে যেন একটু ব্যথিত হইয়াছে—এই ভাব প্রকাশ করিয়া কহিতে গেল,—"সে কি মা-ঠাকরুণ! এ কথা কি বলতে আছে? আপনার ঘর, আপনার সংসার!—আপনার কি এ সব অকল্যাণের কথা বলা উচিত? যদি যেতেই হয়, বাবু বাড়ী আসুন; ধীরে সুস্থে, পরামর্শ করে গেলেই হবে। এমন ভাবে গেলে, বাবু এসে কি মনে ক'রবেন!"

বিনোদিনী তাহাতে আরও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উত্তর দিলেন,—"যা, তোর আর অত হিত-কথা শোনাতে হবে না! এ সংসারে যে যত আমার হিতকারী, তা আর জান্‌তে আমার বাকী নেই। আমার মণি-ভাই বেঁচে থাক; তার সোনার দোয়াত-কলম হ'ক;—আমার ভাবনা কিসের? আমার যে দু'টো কুচোকাচা ছেলেমেয়ে আছে,—সে বেঁচে থাক,—সেই সব মানুষ করে দেবে। আমি দিব্যি করেছি,—আমি আর এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করবো না। এখন তুই গাড়ী ডাকবি কিনা, বল?"

ঝি পুনরপি বলিবার চেষ্টা পাইল,—"তবে কি বাবুর জন্য একটু—"

ঝি আর বলিতে পারিল না। বিনোদিনী বাধা দিয়, নানারূপ অঙ্গভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আরে আমার বাবুরে বাবু! যাদের ইচ্ছে হয় তারা বাবুর মন জুগিয়ে চলুক। আর আমার বাবুতে কাজ নেই! সে যদি মানুষই হ'ত, তা হ'লে কি আর আমায় এত লাথি-ঝাঁটা খেতে হয়? যা— তুই এখনই গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়। যা ভাড়া লাগে, তাই দেওয়া যাবে।"

বিনোদিনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া, ঝি একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। আর কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সে আর তাহা বলিবার সাহস করিল না। তখন, ব্যস্ত-সমস্তে সে গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল। শ্রীমতী বিনোদিনী জিনিষ-পত্র গুছাইতে লাগিলেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে দুই ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যেই বিনোদিনীর বাপের বাড়ী: তাঁহার পিতা ৺ রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরাহনগর-পালপাড়ার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসের তের পার্ব্বণে তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্মের অবধি ছিল না। সম্পত্তিতে তাঁহার যে আয় ছিল, তাহাতে সকল ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। তাই তিনি কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পর সেই ঋণের দায়ে বিষয়-সম্পত্তি প্রায় সমস্তই বিক্রয় হইয়া যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটায় এখন বিনোদিনীর মাতা ও একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসবাস করেন। আয়ের পথ কিছুই নাই; সুতরাং অতি কষ্টে সৃষ্টে তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়।

বিনোদিনীর ভ্রাতার নাম—মণিশঙ্কর। সচরাচর লোকে তাহাকে 'মণি' বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। তাহার বয়ঃক্রম চোদ্দ পনের বৎসর। তাহার বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার পিতা রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় বিনোদিনীর জননীর হাতে গহনা-পত্র এবং নগদ-টাকাও কিছু ছিল। কিন্তু প্রায় চোদ্দ বৎসর কাল অপগণ্ড শিশুটীর লালন-পালনে এবং সাংসারিক নানারূপ ব্যয়-ভার বহন করিতে হওয়ায়, তাঁহার সে সঞ্চিত ধনের সমস্তই প্রায় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র

পুত্র মণির মুখ চাহিয়া, বৃদ্ধা অতিকষ্টে দিনযাপন করেন। কন্যা বিনোদিনী, লুকাইয়া লুকাইয়া কখনও কখনও তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। অথচ, প্রকাশ্যে বিনোদিনী বড়াই করেন,—তাঁর বাপের বাড়ীতে না-জানি কত ধনসম্পদেরই ছড়াছড়ি হইতেছে।

বিনোদিনীর বাপের বাড়ীর এই অবস্থা! কিন্তু বিনোদিনী আজ স্বামীর সংসার ভাসাইয়া দিয়া গরব-ভরে বাপের বাড়ী রওয়ানা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

দিবা অবসান-প্রায়। দিনমণি অস্তাচল-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন; সন্ধ্যা-সতী অবগুণ্ঠনাবৃতা নববধূর ন্যায় ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতেছেন। সন্ধ্যা সমাগত বুঝিয়া, পক্ষিকুল স্বরলহরী তুলিয়া কুলায়াভিমুখে ছুটিয়াছে।

ছয়টা বাজিয়াছে। আপিসের ছুটী হইয়াছে। একে একে আপিসের সকলেই বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সুরেশ বাবু এখনও আপিসে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছেন। একটা 'ঠিক' আর কিছুতেই মিলিতেছে না। বেলা এগারটা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন; এখন ছয়টা বজিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে ঠিক আর মিলিতেছে না। ক্রমে সাতটা বাজিল; আঁধারে চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিল; কিন্তু 'ঠিক' আর মিলিল না। রাত্রি অধিক হয় বুঝিয়া, সেদিনকার মত খাতাপত্র সেই ভাবে রাখিয়া, সুরেশ বাবু বাড়ী রওনা হইলেন। একে সারাদিন পেটে অন্ন নাই; তাহাতে আপিসে 'ঠিকে ভুল' রহিয়া গেল; সুতরাং কি অবস্থায়, কি ভাবে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন,—ভুক্তভোগী ভিন্ন কে তাহা বুঝিতে পারে?

সুরেশ বাবু "গ্রেথাম কোম্পানীর" বাড়ীর একাউণ্টাণ্ট। হিসাব-নিকাশের কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী বলিয়া পরিচিত। যে হিসাবটী লইয়া তিনি আজ গোলযোগে পড়িয়াছেন,—সেটী অতি সামান্য। এমন গোলযোগে তিনি আর কখনও পড়েন নাই। একটী 'এক' যোগ দিতে পুনঃপুনঃ তাঁহার ভুল হইতেছিল। কিন্তু সারাদিন মাথাটা গরম থাকায়, সে ভুল তিনি কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। সারা পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে ঠিকে ভুলের সংশোধন-উপায় নির্ণয় হইল না। একদিকে বাড়ীর গণ্ডগোল—অশান্তি; অন্যদিকে আপিসের ঠিকে ভুল;—নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথাটা কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছিল।

আপিস হইতে বাড়ীতে আসিয়া, সুরেশ বাবু আরও চটিয়া গেলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন—ছেলেপিলেরা কেহই বাড়ীতে নাই, তখন আর তাঁহার ধৈর্য্য থাকে কি? সারাদিনের অনাহারে ও মনঃকষ্টে তাঁহার প্রাণটা বিষম উদ্বেলিত হইয়াছিল। এখন তিনি, একবার জননীর উপর, একবার ভগ্নীর উপর, একবার বা স্ত্রীর উদ্দেশে, আপনার মনের আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কখনও বা আবেগভরে কহিতে লাগিলেন—"বোনটাকে এনেই আমার সোণার সংসারটা এমন ছারেখারে গেল। অভাগী শ্বশুর-কুলেরও সব খেয়েছে, এখন এ কুলেরও সব খেতে বসেছে! আমার এমন সোণার সংসার—আমি এমন শান্তি-সুখে ছিলেম, আমার অদৃষ্টে শেষে এমন ঘটিল কেন? বোনটা এসেই আমার এমন সংসারট ভেঙ্গে দিয়েছে!" কখনও বা জননীকে লক্ষ্য করিয়া সুরেশ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"মা বেটী হতেই আমার সব গেল! বুড়ো বয়সে যেন ভীমরতি হ'য়েছে। খালি ঝগড়া—খালি ঝগড়া—খালি ঝগড়া! জ্বালাতন—জ্বালাতন! বুড়া বেটী এখন ম'লেই বাঁচি!" স্ত্রীর উদ্দেশে কহিলেন,—"সেই কি কম। কালসাপিনীকে ঘরে এনে অবধি এক দিনের জন্যেও আমার সুখস্বস্তি নেই! গিয়েছে—বালাই গিয়েছে!"

এইরূপ বকিতে বকিতে, সুরেশ বাবু, ক্রমে ক্রমে নির্জীব তৈজস-পত্রাদির উপর আপনার গায়ের জ্বালা ঝাড়িতে লাগিলেন। একবার বা ঘটিটায় হাত দিয়া, তাহাতে জল নাই দেখিয়া, সেটাকেই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। একবার বা প্রদীপটা মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে মনে হওয়ায়, এক লাথিতে প্রদীপ ব্যাচারীর প্রাণটা সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিলেন। নিরীহ আয়না ব্যাচারী—আহা! তার দোষ কি!—তার দিকে তাঁর সেই রাগদ্বেষ-পূর্ণ মুখখানাই তো আগে ভ্রূকুটী করিতে গিয়াছিল—তাই একটা তাঁর প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িয়াছিল!—"হাঁ, আমায় বিদ্রূপ!"—সুরেশ বাবু অমনি পদাঘাতে সেই আয়নাখানাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; নিরীহ আয়না-ব্যাচারীর ইহলীলা এইরূপেই সাঙ্গ হইল!

এদিকে সুরেশ বাবুর মাতা ও ভগ্নী—তাঁহারাও বড় কমে যাইলেন না; মা, বিড়ির-বিড়ির আরম্ভ করিলেন,—"পোড়ারমুখো, চোখ-খেকো, একেবারে চোখের মাথা খেয়েছে! বউ তো ঢের লোকের হয়; কিন্তু এমন তো কারো কখনও দেখিনি! বেটী যেন যাদু ক'রেছে গা—যাদু ক'রে রেখেছে।"

ভগ্নীও সেই সুরে সুর মিশাইলেন,—"মা! ও সব আর দুঃখু করিস কেন? সবই আমাদের অদেষ্ট! আমাদের দু'টো খেতে দিতে হয় বলেই, যত কথা!"

ভগিনী আরও রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"কেন?—আমি কি তোমাদের বাড়ী অমনি খাই? খেটে খেটে গতরটা মাটি কোরে দিচ্ছি, তবে তো একমুঠো খেতে দিস! তার আর এত কেন? না হয়, না দিবি খেতে! খাবার আর দুটো ভাবনা কি? এমন কোরে গতর খাটাব যেখানে, সেখানেই দুটো খেতে দেবে। আরে আমার ভাই রে ভাই!"

মা দুই একটা টিপ্পনী কাটেন; ভগ্নী তাহাতে রসান দেন। ভগ্নীও দুই একটা টিপ্পনী কাটেন; মা তাহাতে রসান দেন। সকল কথা শুনিতে না পাউন, দুই একটা কথা কিন্তু সুরেশ বাবুর কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। সুরেশ বাবু আরও চটিয়া উঠিলেন। আপিসের কাপড় চোপড় আর, তাঁহার

ছাড়া হইল না। তিনি তখনই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। হরে চাকরটা একবার আস্তে আস্তে বলিতে গেল,—"কাল সকালে গেলে হ'তো না!" বাবু চটিয়া বলিলেন,—"যা বেটা—যা! তোর আর অত আত্মতায় দরকার নাই! ঈশ্বর যদি কখনও দিন দেন, তবে এ বাড়ীতে ফিরবো—আর তখন দেখা যাবে সব্বাইকে!"

চাকর আর কিছু বলিতে সাহসী হইল না। সুরেশ বাবু আপন মনে বকিতে বকিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীর কর্ত্তা সুরেশ বাবু বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে বাড়ীতে যেন মরা-কান্না উঠিল। মার মনে বিষম অভিমান হইল,—"হাঁ! ছেলে তবে আমার দুঃখ দেখ্‌লে না! আমি যে এত অপমানিত হ'লেম, তাও সে একবার বুঝ্‌লে না! এতই স্ত্রীর বশ যে, মা ব'লে মনে হ'ল না? বউ চ'লে গিয়েছে ব'লে, তারি পাছু পাছু ছুটলো! এত হেনেস্থা—এত অবজ্ঞা!" জননীর নয়নপ্রান্তে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিল। তিনি চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"তবে আর কিসের জন্য কি! কার মায়া! সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে, ছেলে মানুষ কোরে, শেষে সেই ছেলের হাতে এতদূর অপমানিত হ'তে হ'ল!" সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, সেও ভাল; তবু আর এ সংসারে থাক্‌ছি-নে। যেদিকে দুই চক্ষু যায়, সেইদিকে চ'লে যাব। শেয়াল-কুকুরে খেতে পায়, আর আমি এক মুঠো খেতে পাব না? কাল ভোরেই আমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

এইরূপ স্থির করিয়া, পর দিন অতি প্রত্যূষে সুরেশ বাবুর জননী বাটীর বাহির হইলেন। তিনি কোথায় যাইলেন, বা কখন যাইলেন,—কেহই তাহা জানিতে পারিল না।

প্রভাত হইল। কাক ডাকিল। পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই জাগিয়া উঠিল। কিন্তু মা কেন এখনও ঘরের বাহির হইলেন না! সুরেশ বাবুর ভগিনী এতক্ষণ মনে করিয়াছিলেন,—"ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মা ঘুমাইতেছেন। হয় তো বা দুর্ভাবনায় রাত্রি-জাগরণের পর ভোরের সময় তাঁহার তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে।" তাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাকে কোনরূপ ডাকাডাকি করিলেন না। কিন্তু ক্রমে বেলা হইল। কাজের লোক সব কাজে চলিয়া গেল; ঝি-চাকরের পাট-ঝাট সম্পন্ন হইল; কন্যা তখন মাকে ডাকিতে গেলেন। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন,—ভিতর হইতে ঘরের দরজা বন্ধ আছে। সুতরাং বাহিরে দাঁড়াইয়া মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষণ ডাকা-ডাকিতেও কোনও উত্তর পাইলেন না। অবশেষে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। সামান্য ধাক্কা পাইয়াই দরজা খুলিয়া গেল। কন্যা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—ঘরে মা নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন,—"এ কি! মা কোথায় গেলেন!"

ঘরে মাকে না দেখিয়া, কন্যা চিন্তাকুলিত চিত্তে ঘরের বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে চাকর-চাকরাণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা কোথায় গেল?" কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না; পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বাড়ীতে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। আবার মা-জানি কি কোন্দল বাধিয়াছে মনে করিয়া, বামা-পিসী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বামা-পিসীকে দেখিয়া, সুরেশ বাবুর ভগ্নী আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার মা কোথায় গেল—ব'লতে পারিস, বামাপিসী?" সুরেশ বাবুর ভগ্নীর নাম—মোক্ষদা-সুন্দরী।

বামাপিসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া লইলেন। কিরূপ অবস্থায়, কি ভাবে, ঘরের দরজা খোলা ছিল,—সমস্তই নিরীক্ষণ করিলেন। অতি কৌতূহল-সহকারে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, বামাপিসী গম্ভীরভাবে কহিলেন,— "ব্যাপার বড় সহজ বলে তো মনে হচ্ছে না! ঘরের দরজা বন্ধ রইলো, আর

ভিতর থেকে মানুষ উড়ে গেল!—এ ত বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়? আমি যার ভয় ক'রেছিলেম, তাই ঘটেছে দেখ্‌ছি?"

মোক্ষদাসুন্দরী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিলো—কি মনে ক'রেছিলি, বামাপিসী?"

বামা-পিসী গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষন্নবদনে উত্তর দিলেন,—"কি আর ব'লবো মাথামুণ্ড! সে কি আর ব'ল্‌বার কথা! এমন মানুষের যে এমন হ'বে,—তা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বামা-পিসী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বামা-পিসীর মুখবঙ্কেই মোক্ষদাসুন্দরীর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বামা-পিসীর মুখের প্রতি চাহিয়, মোক্ষদাসুন্দরীর প্রাণ উড়িয়া গেল; অন্তরাত্মা দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল। এইবার মোক্ষদাসুন্দরী বাষ্পাকুলিত নেত্রে বামা-পিসীকে অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিল,—"বল্ না বামা-পিসী! আমার মা কোথায় গেল? তোর পায়ে পড়ি বামা-পিসী, বল্‌না রাত্রে কি হ'য়ে ছল?"

বামা-পিসী সুরে সুর মিশাইয়া উত্তর দিল,—"বল্‌তে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! ভোর রাত্রে যখনই কুকুরের কান্না শুনেছি, তখনই বুঝেছি—আজ যেন কার সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোমার মা'র যে এ সর্ব্বনাশ হবে, তা তো আমি কখনও মনে করি নাই!"

মোক্ষদা ক্রন্দনের সুরে কহিল,—"কি বল্‌ছিস বামা-পিসী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি-নে! আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে; পিসীর বল—পিসীর বল, মা কোথায় গেল!"

অগত্যা যেন অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বামা-পিসী কান্না-কান্না সুরে কহিলেন,—"নিশ্চয়ই তাকে নিশিতে নিয়ে গিয়েছে! তা না হ'লে কখনও এমন হ'ত না।"

এই বলিয়া বামা-পিসী কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "ওগো আমার কি হ'ল গো" বলিয়া মোক্ষদাসুন্দরী কান্না আরম্ভ করিয়া দিলেন। [illegible]

তাহাতে যোগ দিল। বামা-পিসী, মোক্ষদাসুন্দরী এবং ঝি—তিন জনের জটলায় পাড়া-প্রতিবাসী আসিয়া তথায় একত্রিত হইল। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে বরিষা বেহালা গ্রাম। সেই গ্রামের ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি বয়সেও যেরূপ প্রবীণ, বিজ্ঞতাও তদ্রূপ সুপরিপক্ব। পাড়ায় যখনই যে কোনও বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বত্রই মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে; নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার সুনাম-সুযশ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পাড়ার রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সহিত হরিদাস বসুর বহুকাল হইতে বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল। দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমায় উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ও হরিদাসের এই বিবাদ মীমাংসার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া আসিয়াছে। তথাপি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশা পরিত্যাগ করেন নাই। আজ আর একবার শেষ চেষ্টা করিতে বসিয়াছেন। উভয় পক্ষই আজ তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত। একবার তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে ধরিতেছেন; একবার তিনি বসুজ মহাশয়ের মাথায় আপন পদধূলি প্রদান করিতেছেন। বিবাদটা যাহাতে মিটিয়া যায়, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা।

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানারূপে মীমাংসার চেষ্টা চলিয়াছে; ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনঃপুনঃ বুঝাইতেছেন,—"মামলা-

মোকদ্দমায় বারভূতকে দিয়ে টাকাগুলো খাইয়ে কি লাভ হ'চ্ছে বাপু? যে টাকাটা উভয় পক্ষের ব্যয় হ'ল, তার সিকি টাকা একপক্ষ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারিলে, এ বিবাদ কোন কালে মিটে যেত! মিছে মিছি তোমাদের এত জিদ কিসে?"

এইরূপ নানা চেষ্টার পর, যখন দেখিলেন—উভয় পক্ষ একটু নরম হইয়া আসিয়াছেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন কহিলেন,—"আচ্ছা, হরিদাস! তুমিই এ বিষয়ে আর একটু ক্ষতি স্বীকার কর। সামান্য ক'টা টাকার মামলা; মনে কর কোন একটা সৎকার্য্যে তুমি দানই ক'রেছ। আমার এ কথা তোমাকে রাখ্‌তেই হ'বে।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় আপনার পদধূলি লইয়া হরিদাস বসুর মাথায় প্রদান করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও তিনি কহিলেন,—"তোমাকেও বলি, চক্রবর্ত্তী ম'শায়, ব্রাহ্মণের কি এই কাজ? ম্লেচ্ছের আদালতে মামলা-মোকদ্দমা ক'র্‌তে যাওয়া কি তোমার ন্যায় নিষ্ঠাবান লোকের পক্ষে শোভা পায়? যাও, তুমি এখনই বসুজাকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। বিবাদ মিটে যাক্।"

উভয়েই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং কেহই তাঁহার কথায় অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উভয়েরই ভাব-ভঙ্গীতে সম্মতির লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন উভয়েরই হাত ধরিয়া নিকটস্থ করিলেন। বসুজা মহাশয়কে বলিলেন,—"নাও, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পায়ের ধূলা নাও?" চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কহিলেন,—"দাও, হরিদাসের মাথায় পায়ের ধূলা দাও?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুই জনেরই হাত চাপিয়া ধরায়, উভয়ের কেহই আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন জ্বলন্ত অনলে যেন বারিবর্ষণ হইল। উভয়েই শান্তভাব ধারণ করিলেন।

এইরূপে বিবাদ মিটাইয়া দিয়া, বহির্ব্বাটী হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন; বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে; রৌদ্র চন্‌চন্

করিতেছে ;—এমন সময় একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া সুরেশ বাবুর মাতা-ঠাকুরাণী সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

সুরেশ বাবুর মাতা—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী। হঠাৎ বেলা দ্বি-প্রহরের সময়, কোনও খবরাখবর না দিয়া, সেরূপ ম্লানমুখে আপনার ভগ্নীকে বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ব্যাপার-খানা কি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জানিতে পারিলেন, ততক্ষণ তাঁহার উদ্বেগের অবধি রহিল না। ভগ্নীর নিকট একে একে সংসারের বিশৃঙ্খলার কথা মোটামুটি শ্রবণ করিলেন; এবং তখন আর তাঁহাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া, আশা-আশ্বাস-ভরসা প্রদান করিয়া স্নানাহারের জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলেন।

রাত্রিতে আরও বিশেষভাবে ভগ্নীর নিকট তাঁহার সংসারের কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিলেন। তখন সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন,—“যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহাতে এ বিশৃঙ্খলা দূর হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তুমি সংসারের কর্তৃঠাকুরাণী; যাহার যে ত্রুটি হউক, সকল ত্রুটি তোমাকেই ঢাকিতে হইবে। সুরেশ তো সেদিনের ছেলে; সে আর সংসারের কি বুঝিবে?” ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন একে একে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, তখন ভগ্নীরও জ্ঞানসঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রোধে অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি যে ভাল কাজ করেন নাই,—ক্রমশঃ তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধ ও অভিমান অন্তর্হিত হইয়া, এখন আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

সেদিন সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন খুব ভোরে ভোরে ভগ্নীকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সঙ্গে লইয়া, একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেলা আন্দাজ দশটার সময় ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগিনেয় সুরেশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীতে আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার বহুক্ষণ বাক্য-
ল না। দেখিলেন,—বাড়ীর দরজায় ঝাঁট পর্য্যন্ত পড়ে নাই; বাড়ীটা পলাতক বাড়ীর মত পড়িয়া রহিয়াছে। দরজায় ডাকিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষণ কাহারও সাড়া পাইলেন না। পরিশেষে পাড়ার একটী বালককে পার্শ্বস্থ প্রতিবাসীদিগের বাটীর মধ্য দিয়া সুরেশ বাবুর বাটীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"ঝি-চাকরই বা গেল কোথায়? আর মোক্ষদাই বা গেল কোথায়? হায়! তিন দিনেই বাড়ীর এই অবস্থা!"

ইতিমধ্যে বাড়ীর দরজা খোলা হইল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন,—মোক্ষদা সুন্দরী একান্তে বসিয়া কাঁদিতেছেন; চক্ষের জলে, তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। মাতুল ও জননীকে সম্মুখে দেখিয়া, তাঁহার শোকাবেগ যেন আরও উছলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মোক্ষদা-সুন্দরীকে শান্ত করিয়া, চাকর-চাকরাণী কোথায় গেল—জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমশঃ জানিতে পারা গেল, তাহারা সুরেশ বাবুর জননীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছে।

যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ী তখনকারমত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। আমিষ রান্নার ঘর কলহের দিন হইতেই বন্ধ ছিল; এখনও সে ঘর বন্ধই রহিল। নিরামিষ রান্নার ঘরেই রন্ধনাদির উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধূমপানের বন্দোবস্তে ব্যাপৃত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধূমপান করিতেছেন; এদিকে রন্ধনাদির আয়োজন চলি-

যাছে; এমন সময় চাকর-চাকরাণী ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তৃঠাকুরাণী প্রভৃতিকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, তাহারা বড়ই আহ্লাদিত হইল। তখন, জলখাবারের পয়সা দিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের দুই জনকে দুই দিকে পাঠাইয়া দিলেন। ঝি বরাহনগর পালপাড়ায় রওনা হইল; চাকর, সুরেশ বাবুকে খুঁজিতে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া দিলেন,—"যেরূপেই হউক, সন্ধ্যার পুর্ব্বে বউমাকে আনা চাই; আর সুরেশকেও খোঁজা চাই।"

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুরেশ বাবুর বাড়ীর পার্শ্বেই বামা পিসীর খোলার ঘর। তিন দিন পরে সুরেশ বাবুর বাড়ীতে লোক-জনের কলরব শুনিয়া, বামা-পিসী মনে করিলেন,—বুঝি আবার কিছু নূতন গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আবার তিনি আসিয়া তথায় সশরীরে আবির্ভুত হইলেন। প্রথমেই সুরেশ বাবুর মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, বামা-পিসী কহিলেন,—"তাই তো দিদি!—এসেছিস? আমরা তো ভেবেই আকুল হ'য়েছিলেম। মোক্ষদা কেঁদে সারা। আমি কত ক'রে তাকে বুঝিয়ে রেখেছি! আহা! এমন কাজ কি কর্ত্তে আছে, দিদি?"

কর্ত্তৃঠাকুরাণী কোন উত্তর দিলেন না। বামাপিসী আবার বলিতে লাগি-লেন,—"আহা! মোক্ষদা আমার কাঁচা মেয়ে! এমন অবস্থায় ফেলে যাওয়া কি তোমার উচিত হ'য়েছিল? যদি কিছু মনেই ছিল—"

বামা-পিসীর কথা শেষ হইতে না হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, বামা-পিসী যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা উল্টাইয়া লইলেন। আনন্দ-প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"দাদাঠাকুর, প্রণাম হই। তা' আপনি এয়েছেন,—বড় ভালই হ'য়েছে! আমি আগেই বলেছিলাম, এমন কাজ করিস-নে দিদি, এমন কাজ করিস্-নে।—সংসারটা ছারেখারে যাবে। তা, আমার কথা কেউ কি শুনলে, দাদাঠাকুর? আমি ভালর জন্যই বলি, দাদা ঠাকুর? আমি তো আর কারুর মন্দের ইচ্ছা কখনও করি নে!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বামা-পিসীর এ সকল কথার কোনই উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, তোমরা সব ভাল আছ ত?"

বামা-পিসী উত্তর করিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম আছি। তা' এখন দিন-কয়েক থাকা হবে তো, দাদাঠাকুর?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—"দুই এক দিন থাকা হ'তে পারে।"

বামা-পিসী কহিলেন,—"বেলা অধিক হইয়াছে; আপনারা স্নান-আহার করুন। আমি আবার আসবো তখন! আপনাদের মত লোককে দেখ্‌লেও পুণ্যি হয়। তা এখন যাই;—বিকালে আবার আসিব।"

বামা-পিসী চলিয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির স্নানাহার নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

* * *

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাত্রিতে সুরেশ বাবু বাগবাজারে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুই দিন সেইখানেই ছিলেন; সেখান হইতেই আপিস করিয়াছিলেন। আজ রবিবার। বৈকালে একবার বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া যাইবেন,—মনে করিয়াছিলেন। সুরেশ বাবু স্নানাহার করিয়া বন্ধুর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, বন্ধুর সহিত আপিসের ঠিক-ভুলটার কথা আলোচনা করিতেছেন; বলিতেছেন,—"আমি তিন দিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া সে ভুল মিটাইতে পারিলাম না; কা'ল সোমবার 'রিটার্ণ' দিতে হইবে; কি বলিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইব, ভাবিয়া পাইতেছি না।" এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য হরিদাস তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাগবাজারের এই বন্ধুর বাড়ী হরিদাসের জানা-শুনা ছিল। সহসা হরিদাসকে দেখিয়া সুরেশ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে হরে! তুই বেটা এখানে কেন?"

হরিদাস উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, বেহালার ঠাকুরদা ম'শায় এসেছেন। আপনাকে তাই খুঁজতে বেড়িয়েছি। চলুন, তিনি আপনাকে ডাকছেন।"

অনেক দিন পরে মাতুল মহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া, আপন বাড়ীর বিশৃ-ঙ্খলার বিষয় স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া, সুরেশ বাবু বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বাগবাজারের বন্ধুও তাঁহার সহগামী হইলেন।

এদিকে সুরেশ বাবুর স্ত্রী বিনোদিনীকে আনিতে ঝি বরাহনগরে গিয়াছিল। পিত্রালয়ে গিয়া বিনোদিনীও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একে সে সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল নহে; তাহার উপর তাঁহার বাড়ীতে কি দুর্ঘটনাই বা ঘটিতেছে—এই ভাবিয়া বিনোদিনী চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অভিমানভরে চলিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং আপনা-আপনি ফিরিয়া যাইতেও লজ্জা-বোধ করিতেছিলেন। তাঁহাকে লইবার জন্য তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী হইতে যখন ঝি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর তিনি দ্বিরুক্তিটি করিলেন না। বরং বিদায়গ্রহণকালে জননীকে কহিলেন,—"সংসারে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপ-স্থিত; না যাইলে কোন মতেই চলিতেছে না।" এই বলিয়া, জননীর চরণে প্রণাম করিয়া, ছেলে-মেয়ে দু'টীকে সঙ্গে লইয়া, বিনোদিনী, ঝির সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী কলিকাতা অভিমুখে বিনোদিনীর শ্বশুরালয়ের দিকে ছুটিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণ পাঁচটার মধ্যে সকলেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সুরেশ বাবু আসিয়াছেন; তাঁহার স্ত্রী-পুত্রও আসিয়াছে। বাগবাজার হইতে আসিবার সময়, সুরেশ বাবু একটা বড় রুইমাছ এবং এক হাঁড়ি সন্দেশ কিনিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বিনোদিনীও বাপের বাড়ী হইতে প্রত্যাগমনকালে, বাপের বাড়ীর গৌরব-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এক হাঁড়ি রসগোল্লা এবং একটা ইলিশ মাছ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাড়ীতে পাইয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর আনন্দের অবধি নাই। সুরেশ বাবুর ছেলে-মেয়ে দু'টীকে কোলে লইয়া, তিনি কতই আদর করিতে লাগিলেন।

দুই দুইটা মাছ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, এইবার আমিষ রান্নার ঘর খোলার ব্যবস্থা হইল। রান্নাঘর পরিষ্কার করিতে গিয়া, দরজা খুলিয়াই, আপন স্বভাবসিদ্ধ স্বরে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। ঝির চীৎকার শুনিয়া, বাড়ীর সকলেই তখন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গেলেন; সুরেশ বাবু গেলেন; কর্ত্রীঠাকুরাণী গেলেন; মোক্ষদাসুন্দরী গেলেন; বধূ বিনোদিনীও অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; চাকর হরিদাস উঠানে ছুটিয়া আসিল। "কি হইয়াছে", "কি হইয়াছে" বলিয়া সকলেই একটা গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই গণ্ডগোলে বামাপিসীও আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

ব্যাপারখানা কি? হইয়াছে কি?—অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথার কোনও সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না। ঝি কেবল দাঁতমুখ শিটকাইয়া বলিতে লাগিল,—"বাপ্! কি দুর্গন্ধ! ঘরে তো আর ঢোকা যায় না! দুর্গন্ধে অন্নপ্রাসনের ভাত পর্য্যন্ত যেন বমি হয়ে উঠ্‌ছে।" সকলেই তখন সে দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন। কিন্তু দুর্গন্ধ যে কোথা হইতে আসিতেছে, কিছু ক্ষণ তাহা নির্ণয় হইল না। পরিশেষে ঘরের জানালা-দরজা সকলই খুলিয়া দেওয়া হইল। তখন ঘরে প্রবেশ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, রান্নাঘরের উত্তরদিকের

কোলঙ্গা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। একটু নিকটস্থ হইলেই সকলে দেখিতে পাইলেন, কোলঙ্গায় মাছের 'পেছের' উপর মাছ পচিয়া রহিয়াছে; এবং তাহাতে পোকা লাগিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন,—"কি নির্ব্বোধ এরা! এদের সামান্য বুদ্ধি-শুদ্ধিটাও নাই!"

যাহা হউক, অতঃপর কি কোলঙ্গা পরিষ্কার করিল; পচা মাছ বাহিরে ফেলিয়া দিল। কাহারও আর তখন বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যে মাছ বিড়ালে খাইয়াছে বলিয়া এত গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছিল;—এমন কি একটা সংসার ছারেখারে যাইতে বসিয়াছিল,—সেই মাছই এইভাবে পচিয়া রহিয়াছে; অথচ, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখে নাই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, বাড়ীর কাহারও লজ্জার আর অবধি রহিল না। কর্ত্তৃঠাকুরাণী লজ্জায় অধোবদন হইলেন; বধূ বিনোদিনী ও কন্যা মোক্ষদাসুন্দরী দারুণ আপশোষ করিতে লাগিলেন; সুরেশচন্দ্র বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন।

তখন বামা-পিসী বড় গলা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমাদের কি আক্কেলখানা গা? বেড়ালে মাছটা খেলে কি না-খেলে, তোমরা একবার চেয়ে দেখ্‌লে না?—আর তাই নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে? তোমরা বেহদ্দ ক'রে দিয়েছ বাপু। কাকে কাণ নিয়ে গেল শুনে, কাকের পিছু-পিছু কি ছুটতে হয়? সত্যি-সত্যিই কাণ-দুটো কাকে নিয়ে গেল কি না, একবার কাণে হাত দিয়ে দেখ্‌লে না!"

বামা-পিসীর এতাদৃশ বাক্যবাণে সকলেরই প্রাণ জর্জ্জরিত হইল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কেহই কিছু উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার সহিত উত্তর করিয়াই বা জয়লাভের আশা কোথায়? কথার উত্তর না পাইয়া, বামা-পিসী কথার উপর আর কথা বাড়াইবার অবসর পাইলেন না। আপন মনে বকিতে বকিতে, আপনার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। এদিকে রন্ধন ও আহারাদির উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি শেষ হইলে, সংসারের সকলকে একত্র করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝাইতে লাগিলেন,—"এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা কি ক'রে ফেলেছিলে, ভাব দেখি? সংসারটা যে একেবারে ছারেখারে দিতে বসেছিলে! বিড়ালে মাছ খাইল কিনা, সেটুকু পর্য্যন্ত কেহ দেখিবার অবসর পাইলে না; অথচ, বিড়ালে মাছ খাইয়াছে বলিয়া, হুলুস্থূল বাধাইয়া দিলে! যদিই মাছ বিড়ালে খাইত, তাহাতেই বা কি আসিয়া যাইত! সামান্য একটা মাছ বই ত নয়! বিড়ালে মাছ খাইয়াছে বলিয়া কি সংসারটাকে জাহান্নমে দিতে হইবে? কত পয়সা কত দিকে নষ্ট হয়; চোরে ডাকাতে কত লোকের কত টাকা-কড়ি চুরি ক'রে নেয়; মামলা-মোকদ্দমায়ও লোকের কত টাকা অপব্যয় হয়; কিন্তু সাত আনার একটা মাছ বেড়ালে খেয়েছে বলে, তোমাদের আর সহ্য হ'ল না! তোমরা কি ক'রে যে এ সংসার বজায় রাখ্‌বে, তা আমার বুদ্ধিতেই আসে না।"

ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বোন! তুমি এ সংসারের কর্ত্রী-ঠাকুরাণী। সংসারের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া, সকলের সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সামঞ্জস্য বিধান করাই তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে তোমার কি অত উতলা হওয়া ভাল? সংসারে কেহ বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইলে তুমি কোথায় সান্ত্বনা করিয়া সে বিবাদ মিটাইয়া দিবে, তা-না তুমিই বিবাদ-বিসংবাদের মূলীভূত হইয়া দাঁড়াইলে? যাহা হউক, ভবিষ্যতে আর যেন এমন না হয়, ইহাই আমার অনুরোধ। সংসারের অপর সকলেই তোমার স্নেহের—তোমার আশীর্ব্বাদের পাত্র, এই কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিও; অধিক আর তোমায় কি কহিব?"

অতঃপর বিনোদিনী ও মোক্ষদাসুন্দরীকে কহিলেন,—"তোমাদের জননীর কথার উপর কথা কহা তোমাদের বড়ই অন্যায় কাজ হইয়াছে। গুরুজনকে যেরূপে ভক্তি ও সম্মান করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে অধঃপাতে যাইতে হয়।

তাঁহার সহিত বাগবিতণ্ডা করা তো দূরের কথা; তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া পালন করা কর্ত্তব্য। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। ভবিষ্যতে আর কখনও যেন তোমাদের এতাদৃশ আচরণের কথা না শুনিতে হয়। যাঁহাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য, তাঁহাকে অপমানজনক কথা বলায় যে পাপ হইয়াছে, তজ্জন্য তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা কর; এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও।”

বিনোদিনী ও মোক্ষদাসুন্দরী পূর্ব্বেই জননীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাগিনেয় সুরেশচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন,—“সুরেশ! এই ব্যাপারে তোমার দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রথমতঃ জননীর ন্যায় পূজনীয়া এ সংসারে তোমার আর দ্বিতীয় কেহই নাই। তুমি বিজ্ঞ ও বয়স্থ; বিশেষতঃ তোমারও পুত্রকন্যা হইয়াছে; সুতরাং পিতামাতা যে কি সামগ্রী, তোমাকে আর তাহা বুঝাইয়া কি বলিব? কি কষ্টে, কি প্রাণপাত যত্নে, এক একটী পুত্র-কন্যাকে মানুষ করিতে হয়, আপনার পুত্র-কন্যা হওয়ায়, তুমি এক্ষণে তাহা সকলই বুঝিতে পারিতেছ। মনে কর দেখি,—তোমার সেই স্নেহের পুত্র-কন্যা যদি কখনও তোমার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে তোমার মনে কি ভাব উপস্থিত হইতে পারে? তোমার জননীর সেই স্নেহ-যত্নের পুত্র তুমি,—কিন্তু তুমি তোমার জননীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলে না? ইহাই কি তোমার ধর্ম্ম? ইহাই কি তোমার কর্ম্ম? ইহাই কি তোমার এতদিনের সুশিক্ষা? সুরেশ!—এক্ষণে তুমিই এ সংসারের কর্ত্তা। সংসারের যত দায়-অদায়, তোমাকেই তার বিচার কর্‌তে হবে; সকলেরই মীমাংসার ভার তোমার উপর। কিন্তু তুমি একবার শুন্‌লেও না যে, কেন এমন হলো বা কিসে এমন হলো! বিবাদের মূল কি এবং কিসেই বা এ বিবাদ মিটিতে পারে,—তোমার কি একবার তদ্বিষয়ে সন্ধান লওয়া উচিত ছিল না? সংসারের

অনেক সইতে হয়, অনেক বুঝ্‌তে হয়, অনেক ভুগ্‌তে হয়। কিন্তু এই সামান্য একটা ঝগড়া—যা'র মূলে ঝগড়ার কোন কারণই ছিল না—সেটী তুমি মেটাতে পার্‌লে না? সামান্য কারণে এতই বিচলিত হয়ে পড়লে? যে মাছ নিয়ে ঝগড়ার সূত্র, সেই মাছ বিড়ালে খাইল কি না, তাহা একবার চাহিয়াও দেখিলে না; অথচ, ঘোর বিতণ্ডা বাধাইয়া দিয়া সংসারটাকে জাহান্নমে দিতে বসিলে? ছি!—ছি!"

এইরূপ তীব্র তিরস্কারের পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সংসারীর কর্ত্তব্য-বিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন। কি ভাবে, কিরূপ স্থৈর্য্যের সহিত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন। পরিশেষে কহিলেন,—"এইরূপ মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা লইয়াই সংসারে সচরাচর বিবাদ বিসংবাদ হইয়া থাকে। সকলেরই পক্ষে সাবধানতার সহিত এ সকল কলহ পরিহার করা কর্ত্তব্য। তুমি এখন সংসারের প্রধান ব্যক্তি; তোমারই এ সকল মিটাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এখনও সাবধান হও,—এই আমার শেষ বক্তব্য।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথায় সকলেই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইলেন; সকলেই আপনাপন ক্রটি-বিচ্যুতির বিষয় বুঝিতে পারিলেন; সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

সেই হইতে সে সংসারে আর কোনও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। কি ভ্রমে কি অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছিল বুঝিতে পারিয়া, সকলেই এখন সাবধান হইয়াছেন! কর্ত্তৃঠাকুরাণী এখন প্রকৃতই কর্ত্তৃঠাকুরাণী হইয়া বসিয়াছেন; এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারেই সংসারের সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। বিনোদিনী ও মোক্ষদাসুন্দরী এখন সম্পূর্ণ, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। সুরেশচন্দ্র এখন আর জননীর মত না লইয়া কোনও কাজই করিতে প্রস্তুত নহেন। বিড়ালটাকে এখন আর কেহ তেমনতর দূর-ছেই করে না, বরং তাহার আদর এখন যেন একটু বাড়িয়াছে। সুরেশ বাবুর আপিসেরও সকল

গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছে, ঠিকে ভুল ধরা পড়িয়াছে। সংসারে এখন শান্তি বিরাজমান।

পাঠকগণ! এখন নিজ নিজ সংসারের অবস্থা ও ঘটনা অনুসারে বুঝিয়া লউন;—অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন,—প্রত্যেক সংসারেই কি ভ্রমে কি কথায় কি অনর্থ না ঘটিয়া থাকে।

সমস্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"না—না, এও কি হ'তে পারে?"

"হাঁ— এই-ই বটে।"

"যাক—যাক, আর তামাসার দরকার নেই। এখন, কি কি দেখে এলে, বল দেখি?"

"আমি কি আর মিছে বলছি? আমি স্বচক্ষে দেখেছি—তোমার দিব্যি!

রামশরণ বাবুর বদনে বিষণ্ণতার রেখাপাত হইল—তিনি একটু দমিয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ আমতা-আমতা-সুরে কহিলেন,—"তোমার চিরদিনই ঐরকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা স্বভাব। আমি ভেবেছিলেম, এতদিন নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসে, কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য হ'য়ে থাকবে। তা না, এখনও তোমার সেই ভাব!"

"যাই বলুন, বস্তুবিক আমি ঠাট্টা করছি না। তাহ'লে, এত দিব্যি-দিলাসরই বা করবো কেন?"

প্রফুল্লচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ গম্ভীর-ভাবে কথাগুলি কহিলেন। কিন্তু রামশরণ বাবুর তথাপি বিশ্বাস হয় না; তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যি বলছ— আমার দিব্যি!"

প্রফুল্লচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্তিস্বরে উত্তর করিলেন,—"বলছি তো বটেই, তবে আপনার বিশ্বাস! তা যাক—ও সব কথা ছেড়ে দেন—আমি না হয় মিথ্যেই বলেছি?"

"না—না, তা কেন? তবে বলছি কিনা—কি দেখে এলে, খোলসাই বল না!"

রামশরণ বাবুর কণ্ঠস্বর আপনা-আপনিই যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্রফুল্লচন্দ্র অনেক ইতস্ততের পর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভিড়ের কথা তো আগেই আপনাকে বলেছি। ঘাটের কিনারাটা প্রায় আধ-ক্রোশ নিয়ে, যেন লোকে ছেয়ে ফেলেছে। জাহাজের উপরে দাঁড়িয়ে, ঘাটের দিকে চেয়ে দেখে, আমার কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো—যেন খালি কতকগুলা মানুষের মাথা, স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। সে ভিড়ে কে কারে দেখে?—কে কার খোঁজ নেয়? সোমবার দিন বেলা দু'পহরের পর প্রথম জাহাজ ছেড়ে চলে যায়। তার ঘণ্টা দুই পরে দ্বিতীয় জাহাজখানা রওনা হয়। এত লোকের ভিড় যে, আমরা হেন ষণ্ডামার্কের দলও বেলা আটটা থেকে চেষ্টা করেও, সে ভিড় ঠেলে সে দু'খানা জাহাজে উঠতে পারিনে। শেষ অনেক কষ্টে, সন্ধ্যার সময়ের শেষ-জাহাজখানা আমরা ধর্‌তে পেরেছিলুম। জাহাজখানা লোকে যেন ডুবুডুবু! কাপ্তেন কিছুতেই আর লোক নিলে না; খালাসীরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,—'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর; কাল আবার দোসরা জাহাজ আস্‌বে, তাতেই তোমরা যেতে পাবে।' লোকজনের কি হাহাকার—কি আর্তনাদ! কিন্তু তখন আর উপায় কি?—জাহাজ ছাড়িয়া দিল! আমি জাহাজের পিছন-দিকের ডেকের উপরে দাঁড়িয়েছিলাম; সুতরাং লোকগুলার আকুলি-ব্যাকুলি অনেকটাই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। সেই সময় আমার বোধ হয়েছিল, দুইটি স্ত্রীলোক—অবশ্য দূর থেকে দেখা—ঠিক তাঁরা কিনা কি ক'রে বল্‌বো—জাহাজের দিকে চেয়ে বিষণ্ণবদনে ফিরে গেলেন। তা' তাঁরা নাও হতে পারেন।"

"তবে তারা কখনই নয়। আমি রইলাম এখানে;—আমার মত না নিয়ে তারা কি কখনও এমন অসম-সাহসিক কাজ করতে পারে? আমি নিশ্চয় ব'ল্‌ছি,—না—তারা কখনই হ'তে পারে না। তারা আমার এমন অবাধ্য

নয় যে, আমার অমতে বাড়ীর বা'র হ'বে। সাধ্য কি তাদের? বিশেষ, টাকা-কড়িই বা তারা কোথায় পা'বে—আমি না দিলে?"

"তা ঈশ্বর করুন—নাই হোন তাঁরা। আমার দেখারই ভুল হোক। অত দূর থেকে দেখা—ভুল হওয়ারই ষোল আনা সম্ভাবনা।"

"তাই হবে।"

বাহিরে ঈষৎ মৃদু হাস্যের সহিত রামশরণ বাবু এইরূপ উত্তর করিলেন,—"তাই হবে।"

প্রফুল্লচন্দ্রও অগত্যা সেই রায়েই রায় দিলেন,—"তা তাই হবে।"

প্রফুল্লচন্দ্র, রামশরণ বাবুর নিকট-আত্মীয়। পাশাপাশি গ্রামে উভয়ের বসতি। কলিকাতায়ও পাশাপাশি বাসায় উভয়ে অবস্থিতি করেন। রামশরণ বাবুর বাড়ীর মেয়ে-ছেলেদের সঙ্গেও প্রফুল্লচন্দ্রের জানা-শুনা আছে। তিনিও তাঁহাদের চিনেন; তাঁহারাও প্রফুল্লচন্দ্রকে জানেন। পুরুষোত্তম হ'তে প্রত্যাগমন-কালে, জাহাজে উঠিবার সময়, প্রফুল্লচন্দ্র যেন রামশরণ বাবুর স্ত্রীকে এবং তাঁহার ভগ্নীকে ঘাটের ধারে দেখিয়াছিলেন; আর তাঁহারা যেন লোকের ভিড় ঠেলিয়া জাহাজে উঠিতে পারেন নাই;—প্রফুল্লচন্দ্রের কথাবার্তায় সেই ভাব প্রকাশ পাইল। কিন্তু রামশরণ বাবু সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহার অনুমতি না লইয়া, তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনী কখনও তীর্থভ্রমণে যাইতে পারে কি? বাড়ীর কর্তা হইয়া, একথা তিনি কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করিতে পারেন? সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল,—"প্রফুল্লচন্দ্রের দেখারই ভুল হইয়া থাকিবে।" তবে বাড়ীর ভৃত্য নবীনদাস পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিল বলিয়া, প্রফুল্লচন্দ্রের কথায় মনটা যে একটু চঞ্চল না হইল, তাহা নহে। সুতরাং বাড়ীতে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত উত্তর পাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামশরণ বাবুর নিবাস—বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে নাম করিলে সে গ্রামখানি অনেকেই বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। কিন্তু নানা-কারণে এ প্রসঙ্গে সে গ্রামের নাম করিতে কুণ্ঠিত হইলাম। একটী ভদ্র-পরিবারের পারিবারিক অনেক কুৎসার কথা, হয় তো ইহাতে প্রকাশ হইতে পারে; সুতরাং নাম-ধাম-পরিচয়াদি প্রদানে, লোকসমাজে তাঁহাকে আর অপদস্থ করিয়া ফল কি? বিশেষতঃ সে নামে এমন কোনও প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষনার কথাও নাই,—যাহা না জানিতে পারিলে পাঠকগণের জ্ঞান-বুদ্ধির পক্ষে কোনরূপ হানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে যদি গ্রামের একটা নাম জানিতে না পারিলে কাহারও চাঞ্চল্য-কৌতুহল ক্রমাগত বাড়িয়াই উঠে, চিন্তাজ্বরে শরীরটা একেবারে গরম করিয়া তোলে; অথবা মাথা ধরে, সর্দ্দি লাগে, গা কেমন-কেমন করে; তাহা হইলে আর না বলিয়া উপায়ান্তর নাই! কাহার কি প্রকার মনোবৃত্তি, অথবা কি কথায় কাহার কি ইষ্টানিষ্ট ঘটিতে পারে,—তাহা যখন নির্ণয় করা দুর্ঘট; তখন একটা না একটা নাম বলিয়া দিয়া দায়িত্ব কাটান বোধ হয় মন্দ হইবে না। উপন্যাস-কারেরা প্রায়ই এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন; সত্যমিথ্যা যাহা হউক একটা কিছু বলিয়া দিতে কখনই তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন না। অতএব কাহারও মনে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ রাখা অপেক্ষা সত্য-মিথ্যা একটা নাম বলিয়া দিতেই বা হানি কি! সত্য সত্যই কেহ তো আর কখনও উপন্যাস-বর্ণিত কোনও গ্রাম বা ব্যক্তির তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন না? যদিই বা পরবর্ত্তী কালে তেমন প্রত্নতত্ত্বী কেহ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সূক্ষ্মানুসন্ধানের বা গভীর গবে-ষণার পক্ষে, ইহা বরং এক উপাদেয় সামগ্রী হইতে পারিবে। কারণ, তিনি যখন ঐ নামের ঐ গ্রামের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কত কথাই লিখিতে পারিবেন, কত কথাই কহিতে পারিবেন, কত পল্লীর কত ভগ্নাবশেষ কত

ধূলিকণা হইতে কত উপকথাই আবিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। ফলতঃ, রামশরণ বাবুর বাস গ্রামের একটা নামোল্লেখের আবশ্যকতা পদে পদেই দৃষ্ট হইতেছে না কি?

তবে মনে করুন, সে গ্রামের নাম—বৈদ্যপুর। পছন্দ হইল না? আচ্ছা,—চন্দ্রভাগ! তাহাও অপছন্দ হয়—শ্যামসুন্দরপুর, হরিণশোরগড়, ধনধাননগর,—ইত্যাকার একটা নাম মনে করিয়া লউন না কেন? যাহা হউক, সেই তথানামা গ্রামের ভট্টাচার্য্যপাড়ায় রামশরণ বাবুর পৈতৃক বাসভবন। সে বাটীতে—তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী নীরদা-সুন্দরী এবং ভগিনী শ্যামাঙ্গিনী অবস্থিতি করেন। পুরুষের মধ্যে ভৃত্য নবীনদাস—অনেককেলে চাকর—বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবকরূপে নিযুক্ত আছে। রামশরণ বাবু চাকুরী উপলক্ষে সর্ব্বদাই কলিকাতায় থাকেন। বৎসরের মধ্যে শারদীয়া পূজার সময় এবং কচিৎ কখনও বড় দিনের ছুটিতে এক একবার বাড়ী আসেন। এ বৎসর বড় দিনের ছুটিতে তাঁহার বাড়ী আসা হয় নাই; মনে করিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে একবার বাড়ী আসিবেন। ভৃত্য নবীনদাস, পাড়ার একজন লোকের দ্বারা পত্র লিখাইয়া, তাঁহাকে শীঘ্র একবার বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; পত্রে জানাইয়াছিল,—"মা-ঠাকরুণ ও দিদি-ঠাকরুণ পুরুষোত্তমে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। গ্রামের অনেকেই যাইতেছে। তাঁহাদের আটকাইয়া রাখা আমার সাধ্য নহে। আপনি শীঘ্র আসিয়া একটা ব্যবস্থা করিবেন।" সে পত্রের উত্তরে 'শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি,' এই কথাই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কবে যাইবেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া লিখিতে পারেন নাই; পরন্তু, আপন স্ত্রী ও ভগিনীর পুরুষোত্তম যাওয়া সম্বন্ধেও কোনও উত্তর দিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন,—"শীঘ্রই বাড়ী যাইব, বাড়ী গিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিব।"

রামশরণ বাবুর ভগ্নীর নাম—শ্যামাঙ্গিনী; পত্নীর নাম—নীরদাসুন্দরী শ্যামা

ও নীরদা প্রায় সমবয়সী। উভয়েরই বয়ঃক্রম পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। শ্যামাঙ্গিনীর শ্বশুরবাড়ী হুগলী-জেলার ভদ্রবাটী-গ্রামে। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী কেহই জীবিত নাই। তাহার এক ভাসুর এখন সে সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার স্ত্রী, শ্যামাকে বড় দেখিতে পারেন না; সুতরাং শ্যামা প্রায়ই ভাইয়ের বাড়ীতে পড়িয়া থাকে। বিশেষতঃ গত তিন বৎসর হইতে শ্বশুর-বাড়ীর সহিত সম্পর্ক তাহার একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সময় হইতে তাহার স্বামী হৃদয় নিরুদ্দেশ বা মৃত। প্রচার এই যে,—তিনি চাকরীর চেষ্টায় ঢাকায় গিয়াছিলেন; ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন-কালে পদ্মার উপর নৌকা ডুবিতে তিনি মারা পড়িয়াছেন; যাহারা সে নৌকায় ছিল, তাহারা বলে, তাঁহাকে স্পষ্টই মরিতে দেখিয়াছে। এত দিন পর্যন্ত এই ঘটনাই একটান প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তবে অধুনা কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, এক বৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ের মত একজন যুবককে নবগ্রামের কৃষ্ণকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন রাত্রে কলিকাতার কোনও কু-স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা, ভগবান জানেন। তবে হৃদয় মরিয়াছে, এই কথাই এখন রাষ্ট্র। মরিয়া সে ভূত হইয়াছে কি না তাহা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। যাহা হউক, শ্যামার পক্ষে এখন উভয় সংবাদই সমান। পতিবিরহিণী অভাগিনী শ্যামা, এখন একরূপ বৈধব্যের অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে। শিরোমণি মহাশয়ের বিধান-অনুসারে হৃদয়ের প্রেতকার্য্যে বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়া, হাতের 'নোয়া'-গাছটী সে এখনও পরিত্যাগ করে নাই বটে; কিন্তু অশনে, শয়নে, বসনে, স্বপনে, সর্ব্ববিষয়েই বৈধব্যের লক্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়। পতিশোকে অভাগিনী পাগলিনী প্রায় হইয়া আছে। সুতরাং তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাহার কোনও ইচ্ছায় প্রায় কেহ বাধা দেন নাই।

পাড়ার অনেকেই এবার পুরুষোত্তমে যাইতেছে; এরূপ সুযোগ সহজে আর হইবে না;—কতকটা এই বুঝিয়াও, রামশরণ বাবুর জননী আপন কন্যা ও

পুত্রবধূকে পুরুষোত্তমে যাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রওনা হইবার সময় নবীনদাস বাড়ী ছিল না; তাহার পুত্রের জ্বর হইয়াছে শুনিয়া, কয়েকদিনের জন্য সে তখন গঙ্গাপারে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে যখন সংবাদ দিয়াছে, এবং রামশরণ বাবু যখন শীঘ্রই বাড়ী আসিবেন লিখিয়াছেন, আর তখন তাহার ভাবনা কি? কর্ত্তা আসিয়া ভাল মন্দ ব্যবস্থা অবশ্যই একটা স্থির করিবেন এই মনে করিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এদিকে, "আজ যাই,—কাল যাই" করিয়া, আপিসের কাজের ভিড়ে রামশরণ বাবুরও আর বাড়ী যাওয়া হয় নাই, অথচ তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনী 'সেখোদের' সঙ্গে পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন। নবীনদাস আর কোনও সংবাদ দিবার অবসর পায় নাই; পরন্তু জননীও যেন ইচ্ছা করিয়াই কোনও সংবাদ দেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—"চিঠি লিখিয়া পুত্রকে উতলা করার আর দরকার কি? বাড়ী আসিলে বুঝিয়া সকল কথা বলিলেই চলিবে।"

প্রফুল্লচন্দ্রের কথার পর নবীনদাসের পত্রের কথা স্মরণ হওয়ায়, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও, রামশরণ বাবু বাড়ী যাইতে পারিলেন না; পুনশ্চ বাড়ীতে পত্র লিখিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্রের উপর পত্র—কত পত্রই দেওয়া হইল। স্ত্রীর নামে লিখিলেন, ভগ্নীর নামে লিখিলেন, অবশেষে মার নামেও লিখিলেন। কিন্তু উত্তর নাই! বাস্তবিক কোন বিপদ-আপদ ঘট্‌লো নাকি? চিঠি লিখ্‌তে, ভগিনীও লিখিতে পারিত, স্ত্রীও লিখিতে পারিত! নবীনও না লিখাইতে পারিত, এমন নহে। তবে কেন এমন হয়? রামশরণ বাবু বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। ইহার উপর সময় সময় আবার প্রফুল্লচন্দ্রের কথাগুলি বিদ্যুদ্বৎ মনোমধ্যে চমকাইয়া উঠায়, তিনি অধিকতর উদ্বিগ্ন হইলেন। এখন, এক একবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"তবে কি প্রফুল্লের কথাই ঠিক? তবে কি প্রফুল্ল পুরীর ঘটে যে যাত্রীদের দেখিয়াছিল, তাহারাই আমার স্ত্রী ও পরিবার হইতে পারে?—আমায় লুকাইয়া তাহারা পুণ্যসঞ্চয় করিতে গিয়াছে?" পরক্ষণেই অমনি স্নেহ-মমতা-ভালবাসা-আদি মনোবৃত্তিনিচয় সে সন্দেহ-আন্দোলনে অন্তরায় হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"না-না, তাও কি হ'তে পারে? তারা কি আমার এত অবাধ্য হ'বে? আর তা'হলে, মাই বা কোথায়? মাকে তো প্রফুল্ল সে ভিড়ের মধ্যে দেখ্‌তে পায় নি! তারা গেলে, মাকে কি কখনও ফেলে যেতে পারে? মা ইবা তা থাক্‌বেন কেন? মা সঙ্গে গেলে, মাকে নিশ্চয় দেখ্‌তে পেতো! আরও তারা লুকিয়েই যদি গিয়ে থাকে, মা নিশ্চয়ই সংবাদ দিতেন। তবে কখনই তারা নয়।"

এইরূপ নানা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তায়ই দিন কাটে। কখনও ভাবেন,—"তারা নয়।" কখনও মনে হয়,—"তবে কি প্রফুল্ল ভুল দেখিল!" পরন্তু একটা স্থিরসিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর নিকট-সম্পর্কীয় গ্রামের দুই-একজন মুরুব্বি-পক্ষকে পত্র লিখিয়া সংবাদ আনাইবেন—কি নিজে একবার বাড়ী যাইয়া সব দেখিয়া শুনিয়া আসিবেন,—এমনই

একটা দুর্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন—"একবার আপিসে গিয়া দেখা যা'ক; যদি ছুটী পাই, তবে তো আর কথাই নাই; নয় তো সেখান থেকেই গ্রামের কাহারও নামে পত্র পাঠাইব।"

ইতিমধ্যে ডাকপিওন এক পত্র লইয়া উপস্থিত!—"রামশরণ বাবু আছেন—রামশরণ বাবু বাসায় আছেন?"

রামশরণ বাবু সবে মাত্র পোষাকটী আঁটিয়া, ঝির হাত হইতে তামাকের কলিকাটী হাতে ধরিয়াছেন; এমন সময় এই ডাক!

"ঝি! দেখ্‌তো—দেখ্‌তো!"

বলিতেও আর বিলম্ব সহিল না; জানালা হইতে ডাক-পিওনকে দেখিয়া, কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে, নিজেই ঘরের বাহির হইলেন; আদরের হুঁকা-কলিকা, অনাদরে অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তাহাদের চক্ষের জলে অভিমান আগুন ভাসমান হইল, বাবুও পত্র-হস্তে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আবার তামাকের হাত করিতে হইবে ভাবিয়া, ঝি রাগে গিসগিস করিতে লাগিল।

রামশরণ বাবু সেদিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া তাড়াতাড়ি চসমাখানা একবার কোঁচার খুট দিয়া মুছিয়া লইলেন। দুই-তিনবার নাক-চোখ টেপা-টিপির পর চসমখানা 'ফিট' হইয়া বসিলে, পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন পত্রখানি সেকেলে মুহুরীর খুঁট আখুরে লেখা। কাজেই অনেক চিবাইয়া ঢোক গিলিয়া পড়িতে হইল;—

"পরম শুভাশীর্ব্বাদরাশয় সন্তু বিশেষঃ, সতত শ্রীশ্রী স্থানে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ পরং। পরে এ বাটীর সমাচার সমস্ত মঙ্গল, আগতে ওখাকার মঙ্গলাদি লিখিবা। সংপ্রতি অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন সংবাদাদিতে বঞ্চিত থাকায় বড়ই চিন্তিত আছি। অচিরে তোমার কুশল-সংবাদ লিখিয়া সন্তোষিবা। পরে তোমার বাটী আসা কি হইল?

এই সময় একবার বাটী আসিলে ভাল হইত। কারণ, চারিদিকে বিপদ। অতএব, ছুটী লইয়া সত্বর একবার বাড়ী আসিবা। কোন মতে যেন অন্যথা না হয়। আমার বহুং বহুং আশীর্বাদ জানিবা। ইতি—

আঃ তোমার মাতাঠাকুরাণী ”

পত্র পড়িতে পড়িতে পাড়ার স্কুলের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১০টা বাজিয়া গেল। বাবুর আর তামাকটাও খাওয়া হইল না; মনে মনে দুর্গা-নাম জপিতে জপিতে তিনি তাড়াতাড়ি আপিসে ছুটিলেন।

রামশরণ বাবু কলিকাতার 'কিন্সলে কিং কোম্পানীর' আপিসে কেরাণীগিরি চাকরী করেন। আপিসটা খুব বুনেদী। নীল ও চায়ের কারবারেই তাহারা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। আপিসের তাঁবে অনূ্যন পঁচিশটা নীল-কুঠী এবং পনেরটা চা-বাগিচা আছে। রামশরণ বাবুর অনেক দিনের চাকরী, সুতরাং তাঁহার উপর একটা ডিপার্টমেণ্টের ভার পড়িয়াছে। চা ও নীলের কাজে যত কুলী-মজুর খাটে, তাহার সমস্ত হিসাব-পত্র তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত হয়। আজ তিনি মনস্থ করিয়াছেন, অধস্তন কোন কর্মচারীর উপর দিন-কয়েকের জন্য সেই ভার প্রদান করিয়া, তিনি একবার বাড়ী যাইবেন। আপিসে আসিয়া, তাড়াতাড়ি নামটা সই করিয়া, অনেকক্ষণ সেই চেষ্টাতেই ঘুরিতেছেন। অধস্তন কর্ম-চারীরও তাহাতে সম্মতি পাইয়াছেন। অতঃপর বড়সাহেবকে একবার জানাইয়া কয়েক দিনের জন্য ছুটী লইবেন,—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তাড়াতাড়ি হাতের কাজ মিটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু এ আবার কি বিঘ্ন! রামশরণ বাবু আপন মনে হিসাব-পত্র মিটাইতে বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে বড়সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দুরং চা-বাগিচা পরিদর্শন করিতে গিয়া, তথা হইতে ছোট-সাহেব যে পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই পত্র ও টেলি-গ্রামে তিনি জানাইয়াছেন,—"তিন মাসের জন্য রামশরণ বাবুকে এখানে পাঠা-ইবেন। এখানকার গোলযোগ অনেকটা নিবৃত্তি হইয়াছে; এখন রামশরণ

বাবুর মত এক্টী ওয়াকিবহাল লোক পাইলে, সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া যাইতে পারি।" ঐ উপলক্ষে তিনি আরও আদেশ করিয়াছেন—"আসিবার সময়, রামশরণ বাবু যেন গোয়ালন্দে দু'এক দিন অপেক্ষা করেন। মেদিনীপুরের চালানী একদল কুলী দুই চারি দিনের মধ্যে গোয়ালন্দে পৌঁছিবার সম্ভাবনা; তাহাদিগকে পাশ করিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে। সেখানকার 'পাশিং-অফিসারকে' ডিস্‌মস্ করিয়াছি; তৎস্থলে নূতন লোক পাঠাইয়াছি। সে লোক পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয়, সেই জন্য এই ভার তাঁহাকে দিবেন।"

টেলিগ্রাম ও পত্র দেখাইয়া, বড়-সাহেব কহিলেন,—"যাও রামশরণ! তোমার ভাল হইবে। মাহিনা বাড়িবে। খোসনাম পাইবে।"

একবার, দুইবার—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া—রামশরণ বাবু পত্র ও টেলিগ্রাম দেখিলেন। মনে কতই আশা-ভরসার উদয় হইল। তাঁহার প্রতি ছোট-সাহেবের এমন উচ্চভাব, বড়সাহেবের এত আশা-ভরসার কথা—পরিণামে কত শুভসংঘটন সম্ভাবনা—এ কি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন?

তাঁহার আর বাড়ী যাওয়া হইল না। চাকরী-জীবী বাঙ্গালীর চাকরীই বুঝি বড়। তাই বাড়ীর মায়া অপেক্ষা চাকরীর উন্নতির মায়াই তাঁহার প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। রামশরণ বাবু বাড়ী যাওয়ার চিন্তা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর এই মর্ম্মে বাড়ীতে এক পত্র দিলেন,—"আমার জন্য কোনও ভাবনা নাই; চাকরীর পক্ষে আমার এক বিশেষ সুবিধা ঘটায় ও একেবারে পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায়, দিন-কয়েকের জন্য আমায় একবার আসামে যাইতে হইল। সত্বরই ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী যাইব। কোনও চিন্তা নাই। আজই আসাম রওনা হইলাম। পৌঁছিয়াই সংবাদ দিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় একমাস হইতে বৃদ্ধার আহার-নিদ্রা বন্ধ। বৃদ্ধা সদাই ভাবে,—"কেন তাদের যেতে দিলাম! যেতে দিলাম তো, পত্র লিখে ছেলের মত নিলাম না কেন? একথা সে শুন্‌লে, কি ভাব্‌বে—কি বল্‌বে?" বৃদ্ধা কখনও সত্য-নারায়ণের সিন্নি মানত করে,—"ঠাকুর! পুত্তলি-গুলি তা'দের ঘরে এনে দেও, আমার সুখ বজায় থাকুক।" কখনও পীর-পয়গম্বরের নিকট ঘোড়া মানসিক দেয়; কখনও বা, মনের বেশী উদ্বেগ উপস্থিত হইলে, রক্ষাকালীর নামে যোড়া-পাঁঠা মানত করে।

এমনই আবেগ-উদ্বেগে বৃদ্ধার দিন কাটে। বৃদ্ধা সদাই রাস্তার দিকে হা করিয়া চাহিয়া দেখে—ঐ বুঝি কা'রা আসিতেছে। অন্যমনস্কে আছে; দূরে পত্র-মর্ম্মর হইল; অমনি বৃদ্ধা চমকিয়া মনে করে—বুঝি যাত্রীদের পদশব্দ। কেহ কোনও কথাবার্ত্তা কহিলে, বৃদ্ধা ভাবে—বুঝি তাহাদেরই কথাবার্ত্তা হইতেছে; অন্যমনে অমনই জিজ্ঞাসা করে—তাহারা কি আসিয়াছে?

গ্রামের আর আর যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর মাটী তো আর থাকে না। দিন নাই, রাত্রি নাই, যখনই সে কথা মনে উদয় হয়, তখনই গিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁ গো! কোন খোঁজ-খবর পেয়েছ কি?"

ক্রমে গ্রামের অপরাপর সকলে ফিরিল। কিন্তু তাহারা কোথায়? বৃদ্ধা আরও উদ্বিগ্ন হইল; প্রত্যেকেরই বাড়ী বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"তে মরা এলে, কৈ—তারা কৈ?" উত্তর সঠিক মিলে না। যাইবার সময় যাঁহারা বড়ই সাহস দিয়াছিলেন,—"আমরা যখন আছি, ভয় কি—স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন, শীগ্‌গীরই ফিরে আস্‌বে;—কোনও চিন্তা নেই;" এক্ষণে তাঁহাদের তোবা-বন্ধ। বড় জোর কেহ বলিলেন,—"তাহারা পশ্চাতে আসিতেছে।" কেহ বা বিস্ময় দেখাইয়া

জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন—তাদের তো আমাদের আগেই আস্‌বার কথা!"
যাহারা নিতান্ত সত্যবাদী, তাহারা আবার বিনাইয়া
হাষ্ট করিতে লাগিল,—"আহা! শ্যামা আর নীরদার অদৃষ্টে যে শেষে এই ছিল, স্বপ্নেও কখনও তা মনে করি-নি। বেটার কুমীর ত নয়—যেন সাক্ষাৎ যম! আহা!—ছুঁড়ীদু'টো সবে মাত্র ঘাটের ধারে পৌঁছেছে, আর কোথা থেকে এসে পড়ে, লেজের ঝাপটা দিয়ে, একেবারে ডুবিয়ে নিয়ে গেল? নিয়তি গো নিয়তি! নইলে, এত লোকের মাঝখান থেকে, তাদেরই বা নেবে কেন?"

কেহ বা উহারও উপর একমাত্রা চড়াইয়া সুর ধরিল,—"শুধু কি নেওয়া? —নেওয়া আর গিলে ফেলা! একদণ্ডও দেখতে দিলে না—দুটো দুটো মানুষ একদম গিলে ফেল্‌লে গো—গিলে ফেল্‌লে?"

এইরূপ হাষ্ট করিয়া, বৃদ্ধার (রামশরণ বাবুর জননীর) জন্য যেন তাহাদের সহানুভূতি সমুদ্র উছলিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যের কেহ কেহ বা অযাচিতভাবেই বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝাইতে লাগিল,—"তা দিদি-মা! কেঁদে আর ফল কি বল? বুড়ো-বয়সে তোমার অদৃষ্টের লেখা, কে খণ্ডাতে পারে?"

বৃদ্ধা যখন এই সকল কথা শুনিতেন, তখন সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থায় থাকিতেন, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। ফলতঃ এই সব নানা-মুনির নানা-ব্যাখ্যা-শুনিয়া, বৃদ্ধা কখনও বা দম্ খাইয়া পড়িতেন; কখনও বা কপালে করাঘাত করিতেন; কখনও বা আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইতেন। যাহা হউক, বৃদ্ধার এই দারুণ অনুশোচনার অবস্থায়, নিতান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহারা দুই-এক জন বরং বৃদ্ধাকে যেন তোষা দিয়া বলিতে লাগিল,—"না দিদিমা, তা নয়—তা নয়! তাঁদের কুমীরে নেয়-নি গো—কুমীরে নেয়-নি! আমরাও তো সেই সঙ্গে ছিলাম, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি,—তাঁরা জাহাজ ধরতে পারেন-নি, তাই পিছিয়ে পড়েছেন। মেলা লোকের ভিড়,

জাহাজে লোক আর ধরে না ; তাই জাহাজ তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল—তাঁরা আর সে জাহাজে উঠতে পারলেন না। পরে, দোসরা জাহাজ পেলে, তাঁরা আসবেন। কোনও চিন্তা নেই দিদিমা, কোনও চিন্তা নেই।"

এই সকল কথা শুনিয়া, বৃদ্ধা মন্ত্রোত্থিত যোগীর ন্যায় উঠিয়া বসিতেন ; আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"তোরা সত্যি বল্‌ছিস্! তারা প্রাণে বেঁচে আছে! তাদের দেখা তবে পাবো ?"

"হাঁ দিদি-মা, হাঁ! আমরা সত্যিই বল্‌ছি। আমরা আগে থেকে জাহাজে উঠে বসেছিলুম ; আমরা ঠিক দেখেছি, তাঁরা উঠতে পারেননি ; যাঁরা কুমীরে খাওয়ার কথা রটিয়েছেন, তাঁরা কি আর কিছু দেখবার অবসর পেয়েছেন। তাঁদের নিজেদেরই আর একটু হ'লে সেই দশা হতো! তা' তাঁরা আর পরের খোঁজ রাখবেন কি ?"

"সত্যি—সত্যি বল্‌ছিস্? আহা! বেঁচে থাক বাছারা—বেঁচে থাক! তবে আস্‌বে তারা?—আস্‌বে?

"আস্‌বে দিদিমা, আস্‌বে! কোনও ভাবনা নেই।"

"আস্‌বে!—আস্‌বে? কিন্তু—আর কবে আস্‌বে? আরও পরে এলে, ছেলে যদি জানতে পারে।" বৃদ্ধার এক একবার ভাবনা হইত,—আরও পরে এলে, ছেলে যদি জানতে পারে!"

এইরূপ দারুণ দুর্ভাবনায় রামশরণ বাবুর জননীর দিন কাটিতে লাগিল ; ওদিকে রামশরণ বাবু চাকরীর মায়ায় আসাম-দুরং-চা-বাগানে রওনা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাঠের পর প্রকাণ্ড মাঠ, জঙ্গলের পর নিবিড় জঙ্গল—কতই অতিক্রম করিতে হয়।

পথে—কোথাও দুর্ভেদ্য শৈলশ্রেণী, কোথাও খরস্রোতা নির্ঝরিণী। কখনও পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়, কখনও প্রবল তুঙ্গতরঙ্গময় নদ-নদীসমূহ পার হইতে হয়। রাজপথ,—কোথাও দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্য দিয়া, কখনও ঋজুভাবে, কখনও বক্রভাবে, আপন মনে অগ্রসর হইয়াছে,—কোথাও বা, পার্ব্বত্য বন্ধুর প্রদেশে, সর্পগতিতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর অঙ্কে আরোহণ করিয়া, নিম্ন হইতে নিম্নতর জলাভূমিতে নামিয়া বিলীন হইয়া আছে। পথে—কত বিঘ্ন, কত বিপত্তি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও বনান্তরে সিংহ-ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে; কোথাও পথপার্শ্বে দূরবনে কুরঙ্গ-কুরঙ্গীগণ চরিয়া বেড়াইতেছে; কোথাও শৃগাল শশক প্রভৃতি ছুটিয়া পলাইতেছে; কোথাও বনবিহারী গজযূথের পদসঞ্চারে বনভূমি প্রকম্পিত হইতেছে। নানা জাতীয় বন্য-জন্তুগণ, বিবিধ বর্ণের বিহঙ্গমনিচয়, বিচিত্র তরুগুল্ম-লতাবলী প্রভৃতির সমাবেশে, সে পথ, কখনও রমণীয়, কখনও ভয়াবহ, কখনও বিস্ময়পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। পথে—ক্বচিৎ জনসমাগম দৃষ্ট হয়; ক্বচিৎ কোনও দূরমাঠে কৃষকেরা হলচালনা করিতেছে; ক্বচিৎ কোনও গোচারণ-ক্ষেত্রে রাখালেরা গরু চড়াইতেছে; ক্বচিৎ কোনও দূর গ্রামে মনুষ্য-সমাগম লক্ষিত হইতেছে; ক্বচিৎ কোন দূরপথে দলবদ্ধ যাত্রিগণ গতাগতি করিতেছে। পথিপার্শ্বে লোকের বসবাস অতি অল্পই আছে।

দূর-দূরান্তরে এক একটী চটি। চটিতে না মিলে খাদ্যদ্রব্য, না মিলে শয়নের স্থান। তবে চটিদার-মহাপ্রভুদিগের কৃপায় কোথাও চোর-ডাকাইত-ঠেঙ্গাড়ে-গণের প্রতিপোষণের অভাব নাই। এরূপ সংবাদ প্রায়ই শুনা যায়—আজ অমুক চটিতে ডাকাইত পড়িয়া যাত্রীদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, কাল অমুক

রাস্তায়, কয়েকটা মানুষের মুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। পথ এমনই দুর্গম্য প্রভৃতির ভয়ে লোকে সচরাচর এ পথে অগ্রসর হয় না; তাহার উপর আবার মানুষ-মারার বিষম বিভীষিকা। মানুষ কত দিকে কত সাবধান হইয়া চলিবে?

একটা প্রকাণ্ড মাঠের পর, বড় বড় গোটা-দুই তিন বটগাছের তলায় গড়ভবানীপুরের চটি। এই চটিতে সপ্তাহে শনি-মঙ্গলবার এই দু'দিন হাট বসিয়া থাকে। হাটের একধারে একখানি খড়ের ছাওয়া ঘর—তাহার দাওয়ায় একখানি মুদির দোকান। মুদি ও মুদিনী ঐ দোকানেই বসবাস করে। দোকানখানি দক্ষিণ-দ্বারী। ঐ দোকানঘরের উত্তরদিকে একটি 'চাতাল' বাহির হইয়া আছে। তাহারই এক পার্শ্বে দোকানদারের রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই চাতালের সম্মুখে একটী উঠান। উঠানের মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ। তুলসীমঞ্চের চারিপার্শ্বে বেদী-বাঁধা; বেদীর চারিধার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; প্রত্যহই উহা নিকানো হয়। উঠানটিতে আবর্জ্জনা ময়লা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! দোকান-ঘরের উত্তরের অংশটকে দোকানীর অন্দর বলিলেও বলা যায়। উহার চারিদিক বন-জঙ্গল ও বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা আছে। পশ্চিমের দিকে ক্ষুদ্র একটু চালা আছে। সেই চালায় একটা লাউয়ের গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে। চালার মধ্যে মুদীর "দুধী গাইটি" বাঁধা থাকে। গরুটী বড়ই লক্ষ্মী; প্রায়ই মাঠে-ঘাটে চরিয়া আসে; মুদি ও মুদিনীর নিকট তাহার আদরের অবধি নাই। কিন্তু থাউক সে কথা। এই মুদীর দোকানখানি ছাড়া আর ঘরবাড়ী এ চটিতে নাই। হাটবারে আর আর যে সব দোকান-পাট বসে, সে সব সেই বটগাছতলাতেই বসিয়া থাকে। দুই একজন দোকানদার, তালপাতা দিয়া ছাইয়া, এক-একটু আচ্ছাদন করিয়া লইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। নিজ গেড়ভবানীপুর গ্রামখানি এই চটি হইতে প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তবে দূর মাঠের মধ্যে এইরূপ হাট ও ঐ মুদীর দোকানখানি

স্থাপনের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কতকগুলি দূরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সুবিধা বুঝিয়া, বিশেষতঃ যাত্রিগণের যাতায়াতের পথ বলিয়া, এই মাঠে এই চটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ হইতে হাঁটাপথে যে সকল যাত্রী পুরুষোত্তম তীর্থে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ এই পথ দিয়াই যাইতে আসিতে হয়। বেঙ্গল-নাগপুর কোম্পানীর রেলপথ মাত্র দশ বার বৎসর খোলা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে পুরী যাইতে হইলে, এইরূপ হাঁটাপথ ও ষ্টীমার ভিন্ন, পুরী যাইবার কোনও উপায়ান্তর ছিল না। হাঁটাপথে চলিতে হইলে, পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ পথি-মধ্যস্থিত চটিতে বিশ্রাম করিতেন। গড়ভবানীপুরের চটি—যাত্রিগণের বিশ্রামাহারের একটী ক্ষুদ্র আড্ডা-বিশেষ। সন্ধ্যা হয়-হয়—এমন সময়, পুরুষোত্তম প্রত্যাগত কতকগুলি যাত্রী, এই চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলিতে ভুলিয়াছি, মুদীর একটী 'টীয়া' পাখী ছিল। দিবসে পাখীটি দোকানের চাতালে দাঁড়ে বাঁধা থাকিত। সন্ধ্যা হইলে দাঁড় হইতে খুলিয়া হাতের উপর বসাইয়া মুদী সেই পাখীটিকে 'কৃষ্ণনাম' 'রামনাম' পড়াইত। মুদী, গাছতলায় একখানা মাদুরে বসিয়া, পাখীটিকে পড়াইতেছে—"পড় বাবা আত্মারাম! পড় বাবা কৃষ্ণ কৃষ্ণ—রাম রাম।" মুদী কতই ভড়ং করিয়া পাখীকে কত নামমালা ও ছড়া শিখাইবার চেষ্টা পাইতেছে। পাখীটা এক-একবার "ক্যাচা-ক্যাচা ক্যাচা-ক্যাচা" করিয়া সাড়া দিতেছে। পাখী কৃষ্ণনাম পড়িতেছে ভাবিয়া, মুদীর আর আহ্লাদের অবধি রহিতেছে না।

মুদিনী, দোকান-পাট সারিয়া, গাল-ভরা একটা পান মুখে পুরিয়া, চুণ ও দোক্তা হাতে করিয়া, মুদীর পার্শ্বে বসিয়া আছে; সময়ে সময়ে মুদীর সেই পাখীপড়ানর গুরুগিরি করিতেও সে ক্রটি করিতেছে না। এমন সময়, যাত্রীদের দলপতি ডাকিল,—"কৈ হে, দোকানদার কোথায়? যায়গা-টায়গা আছে?"

মুদী ও মুদিনীর হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। মুদী, তাকাইয়া দেখিয়া, বলিল,—

"ওঃ! এই কয় জন লোক তোমরা—তারই এত হাঁক-ডাক। দু'শো পাঁচশো লোকের যায়গা পড়ে রয়েছে। এই কয় জনের জন্তেই এত ভাবনা?"

যাত্রিদলপতি বলিলেন,—"কৈ? ঐ তো তোমার একখানি ঘর—এত লোকের যায়গা কোথায় দেবে?"

মুদী কিঞ্চিৎ বিরক্তি-স্বরে উত্তর দিল,—"ঘর তো বটেই! এমন বড় বড় তিনটে বটগাছ, এতেও আবার যায়গার ভাবনা! ঐ নেও—চাটাই নেও—যেখানে ইচ্ছা ব'স—শোও—যা ইচ্ছা কর। যায়গার আবার ভাবনা!"

যাত্রি-দলপতি আবার বলিলেন,—"কেন—ঘর?"

মুদী।—"ওরে আমার কুটুম্বরা রে? আমরা শালারা তবে মরিগে যাই? আরে আমার খদ্দের রে! যাও—যাও বাপুরা—এখানে যায়গা নেই।"

যাত্রি-দলপতি।—"না—না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। তা' এখানে কোন ভয়-ভীত নেই তো?".

মুদী।—"কোন চিন্তা নেই—আমি আছি। আমার নাম—হারাধন চাঁদ।"

যাত্রীরা আর কি করিবে, উপায় নাই, অগত্যা সেই বটবৃক্ষমূলেই রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইল। মুদী বলিয়া দিল,—"তা' ইহাতে তোমাদের সুবিধা বে অসুবিধা হবে না। ভাড়া জনাজত এক পয়সা করে দেবে এখন!"

রাত্রিকাল, অগত্যা যাত্রীরা তাহাতেই সম্মত হইল। সে রাত্রিতে সেখানে রন্ধনাদির সুবিধা ছিল না। সুতরাং কেহ বা মুদীর দোকান হইতে চিড়া-গুড় কিনিয়া তাহা খাইয়া রাত্রি কাটাইল; কেহ বা একেবারেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায় ব্যাপৃত হইল। যাত্রিদলের মধ্যস্থলে সেই বৃক্ষতলে একটী মশাল জ্বলিতে লাগিল।

* * *

সহসা রাত্রিতে এক বিষম দুর্বিপাক উপস্থিত! শ্রীধাম পুরুষোত্তম হইতে দুইটি স্ত্রীলোক এই যাত্রিদলের সঙ্গ লইয়াছিল। দেব-দর্শন করিয়া তাহারাও দেশে ফিরিতেছে। রাত্রি-শেষে তাহাদের এক জনের বিষম ওলাউঠা।

যাত্রীরা সেই দুইটি স্ত্রীলোকের বিশেষ পরিচয় কিছুই জানিত না, বা জানিবার জন্য তেমন চেষ্টাও পায় নাই। কেবল এইমাত্র জানিয়াছিল; 'তাহার দুই ননদ-ভাজ, দুই জনে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছিল। আসিবার সময়কার সঙ্গীদের হারাইয়াছে, তাই তাহাদের সঙ্গে যাইতে চায়। দলের অধিকারী সৎব্যক্তি বলিয়াই হউন, অথবা তাঁহার অপর কি অভিপ্রায় ছিল তাহা ভগবানই জানেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোক-দু'টীকে সঙ্গে লন, এবং দেশে পৌঁছাইয়া দিবার ভরসা দেন। স্ত্রীলোক দু'টী শ্রীধাম হইতে এযাবৎ তাঁহাদের সঙ্গে আসিতেছিল; পথিমধ্যে এই বিপদ!

যে স্ত্রীলোকটীর এইরূপ ব্যায়রাম, সে ভাজ। তাহার নাম বলিয়াছিল—নীরদা। ননদিনীর নাম—শ্যামা। উভয়েই সমবয়সী—উভয়েই সুশ্রী।

তিন বার বমন, তিন বার ভেদ! নীরদার বাক্য বন্ধ, চক্ষু কোটরস্থ, হাত-পা অবশ। অধিকারী হতাশ হইলেন, শ্যামা হতাশ হইল; দলের অপরাপর যাত্রীদের মধ্যেও যাহারা খোঁজ-খবর লইতেছিলেন, তাঁহারাও হতাশ হইলেন। এদিকে ক্রমশঃ রাত্রি শেষ হইয়া আসিল।

অধিকারী ভাবনায় পড়িলেন। এই গড়-ভবানীপুরের চটি হইতে দশ ক্রোশ এক মাঠ, তার পর গড়-সমুদ্রপুর গ্রাম; মধ্যে মাঠ—ধূ ধূ—কোথাও জনপ্রাণীর বিরাম-স্থান নাই। খুব রাত্রি থাকিতে বাহির না হইলে, এই লট-বহর লইয়া, দিনমানের মধ্যে সেখানে পৌঁছান যায় না। পথে চোর-ডাকাত-ঠেঙাড়ের বিষম বিভীষিকা! রাষ্ট্র এই, একটু আঁধার পড়িলে আর নিস্তার নাই। অধিকারী ভাবিতে লাগিলেন,—"তবে উপায় কি? থাকিতে গেলে, একটা দিন মাটি হয়। অত যাত্রীর এক দিনের খরচা কত? বিশেষতঃ, সকলেরই সম্বল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। তার পর, থাকিলেই বা ফল কি?—উহার তো বাঁচিবার আশা কিছুই নাই! মরিয়া গেলে, উহার সৎকারই বা কে করিবে, আর সে সৎকারের খরচাই বা কে দিবে?" এইরূপ নানা বিপদা-শঙ্কায়, অধিকারী, আপন সহকারীর মত জানিতে চাহিলেন। যেমন অধি-

কারী, তেমনই তাঁহার সহকারী। সহকারী উত্তর দিলেন,—"অত কেন? ও তে। আর আমাদের সঙ্গের যাত্রী নয় যে, ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে! ও থাক এখানে পড়ে! আমরা ততক্ষণ এগিয়ে যাই। মুদী বেটাও যেন জানতে না পারে! জানলে, আরও বিপদ ঘটবে। বিশেষ, অজানা-অখরের স্ত্রীলোক—কে ওর খোঁজ-খবর দেবে?" বিশেষতঃ ওলাউঠা-সংক্রামক রোগ; ছোঁয়া-লেপার দোষে পাছে অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ঐ পীড়া সংক্রমিত হয়,—এচিন্তাও তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিল।

তখন, আর সেখানে থাকা নহে—সেই রাত্রেই সার হইয়া গেল। অতি প্রত্যুষে, মুদীকে আর না জাগাইয়া, তাঁহাদের প্রস্থান করাই স্থির হইল। পূর্ব্ব-রাত্রে মুদীকে বলা ছিল যে,—ভোরেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন; এবং তজ্জন্য তাহার প্রাপ্যগণ্ডাও চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং এখন, যাত্রীদের যাওয়ার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। একদিকে স্ত্রীলোকটীর মুমূর্ষু অবস্থা, অন্য দিকে যাত্রীদের পলায়ন-উদ্যোগ!

শ্যামা কিন্তু বড়ই ফাঁপরে পড়িল। এ অবস্থায় একাকিনী স্ত্রীলোক—সেই বা কি করে? একবার তার দাদার কথা মনে পড়িল; ভাবিল,—"কি বলিয়া দাদাকে মুখ দেখাইব?" আবার ভাবিল,—"মা যখন বলিবেন—নীরদাকে কোথায় রেখে এলি, তাঁকেই বা কি বলিব?" এইরূপ কত কথা তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। নীরদা যে সর্ব্বদা তাহাকে আপনা ভগিনীর মত স্নেহ-যত্ন করিয়াছে, সেও যে নীরদাকে 'মার পেটের বোনের মত' দেখিয়া আসিয়াছে, আর একমাত্র তাহারই পরামর্শ-ভরসায় নীরদা যে এই তীর্থযাত্রায় আসিয়াছে,—একে একে এই সব কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। শ্যামার মনে হইতে লাগিল,—"হায়! বউ না মরিয়া আমি অভাগীই কেন মরিলাম না? আমার তো সব সাধই ফুরিয়েছে; আমার আর বেঁচে ফল কি? লোকের যে ভরা-ডুবি হয় বলে, আমার সত্যি সত্যিই তাই হয়ে গিয়েছে; বউকে না নিয়ে, ভগবান কেন আমায় নিলেন না?" শ্যামার বুক ফাটিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

গৃহে আগুন লাগিলে, সঙ্গে সঙ্গে পবনদেব আসিয়া তাহাতে যোগ দেন। নীরদার সঙ্কট অবস্থা দর্শনে, শ্যামার মনে, স্বামীর শোক যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল; বাড়ী থেকে তাঁর বিবাগী হ'য়ে বেড়িয়ে যাওয়া,—পদ্মায় পথে নৌকা-ডুবিতে মারা-পড়া,—ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামা আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে যাত্রীরা ডাকিল,—"চল, চল! আর দেরী করো-না কেউ।"

শ্যামা চমকিয়া উঠিল। শ্যামা তবে কি করিবে? শ্যামা বিষম ভাবনায় পড়িল। আর যে সময়ও নাই! যাত্রীরা যে চলিল!

"শ্যামা! শ্যামা!"

ডাকের উপর ডাক! শ্যামা ভাবিতে লাগিল—"আমি কি করি? এই জনশূন্য প্রান্তরে একাকিনী আমি কি করিব?' যাত্রি-দলপতি আবার ডাকিলেন,—"শ্যামা! শ্যামা!" শ্যামা আর স্থির থাকিতে পারিল না। শ্যামা শুনিয়াছিল,—"এদেশে এপথে একাকিনী পড়িয়া থাকিলে, জাতি-ধর্ম্ম-মান-প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।" সহসা সেই কথা মনে পড়ায়, শ্যামার অন্য ভাবনা—অন্য চিন্তা দূরে গেল; শ্যামা ভাবিল—"এ বিজনে আমি, একলা কি করিয়া থাকিব? শ্যামার মনে বড় ভয় হইল।" শ্যামা, ধীরে ধীরে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে দুই-এক পা অগ্রসর হইল।

কিন্তু এ কি?—শ্যামা আবার ফেরে কেন? মশালের আলোয় নীরদার ম্লানমুখ শ্যামার চকে আবার প্রতিভাত হইল; শ্যামা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"বউ—বউ! না—না, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যা'বো?"

শ্যামা আবার ফিরিল। শ্যামার কাণে কাণে কে যেন বারণ করিল,—"শ্যামা! বউকে ফেলিয়া তুমি কোথাও পালাও? মান-প্রাণ-ধর্ম্মের যে ভয়ে তুমি পলাইতেছ, সে ভয় কোথায় নাই? সাবধান! শ্যামা পলাইও না।" শ্যামা ফিরিল। "যাহা থাকে অদৃষ্টে, বউকে ফেলিয়া আমি পলাইব না"—এই বলে বলিয়া, শ্যামা সেই মুমূর্ষু ভ্রাতৃজায়ার নিকট অগ্রসর হইল।

কিন্তু এ কি! আবার কেন বাধা পড়ে? যাত্রিদলপতি আবার ডাকিলেন,—"শ্যামা—শ্যামা! কোথায় যাও? মরার সঙ্গে তুমিও কি মরতে চাও? এ যে চোয়াড়ের দেশ—শেষে কি জাতিধর্ম্ম খোয়াবে? ফের—ফের। আমার কথা রাখ।"

দলপতি শ্যামার হস্ত ধারণ করিয়া শ্যামাকে ফিরাইবার চেষ্টা পাইলেন; ভয়-ভরসার দ্বন্দ্বে শ্যামা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। দলপতির আহ্বানে শ্যামা বিচলিত হইল। শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ফিরিল—আবার চলিল। কিন্তু কেন চলিল, কোথায় চলিল, শ্যামা তাহার কিছুই চিন্তা করিল না—চিন্তা করিতে অবসরও পাইল না—শ্যামা চলিল।

আর নীরদা? নীরদা সেই মাঠে সেই মুমূর্ষু-অবস্থায় ধরা-শয্যায় পড়িয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহাপুরুষ কহিতেন,—"এ সংসারে কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর নাই। সকলেরই মাথার উপর কাল-পুরুষের খাঁড়া অহর্নিশ লম্বমান রহিয়াছে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেখাইতেন,—"ঐ যে ক্ষুদ্র পতঙ্গটীকে গ্রাস করিবার জন্য একটী ভেক লোলুপ-দৃষ্টিতে অগ্রসর হইতেছে,—তাহার পশ্চাতে একবার চাহিয়া দেখ দেখি? দেখিতে পাইতেছ না কি,—একটি অজগর, বদন ব্যাদন করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেছে? আবার, অজগরের পশ্চাতে চাহিয়া দেখ,—কেমন সুন্দর একটী ময়ূর, অজগরের মুণ্ডটিকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য, কি ভাবে অবসর অন্বেষণ করিতেছে? তার পর, আরও দেখ—ঐ সেই শৃগাল, ময়ূরটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কিরূপভাবে জিহ্বা-লেহন করিতেছে। ঐখানেই

শেষ নহে ;—আরও চাহিয়া দেখ, শৃগালের পশ্চাতে সিংহ, সিংহের পশ্চাতে ব্যাধ, ব্যাধের পশ্চাতে বজ্রহস্তে কালপুরুষ, কিরূপভাবে অবস্থিত রহিয়াছে !”

ফলতঃ একের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেও, অন্যত্র রক্ষা পাইবার উপায় কি আছে ? মানুষ কখনও সে ভাবনা ভাবিয়া দেখে না। ভাবিলেও, তদনুসারে কার্য্য করিতে কচিৎ সমর্থ হয়। আত্মবিপৎপাতের আশঙ্কাতেই তাহারা বিস্মৃত আত্মহারা ; ভবিষ্যতের দূর-পথে স্তরে স্তরে পর্য্যায় পর্য্যায়ে যে বিপদ-পরম্পরা সজ্জিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার ভূয়োদর্শন-ক্ষমতা কোথায় পাইবে ? চকিতের ন্যায় কাচিৎ সে ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইলেও, বিদ্যুতের ন্যায় সে চিন্তা ক্ষণ-দর্পণে এক একবার প্রতিভাত হইলেও, মানুষ সাধারণতঃ তাহার অনুসরণ করিতেই পারে না।

ধীর প্রাজ্ঞ দৃঢ়মনা জনের পক্ষেই সে বিচার যখন অসম্ভব ; আত্মগ্লানি-প্রপীড়িতা শোকতাপ-অভিভূতা দারুণ-কষ্ট-নিপতিতা শ্যামার পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে কি ? সুতরাং শ্যামা ইষ্টানিষ্ট সদসৎ কিছুই বিবেচনা করিবার অবসর পাইল না। বাজারদলের অধিকারীর আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় শ্যামা চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ—তাহার আর কতটুকু সংস্কার জ্ঞান !—সে কি প্রকারে বুঝিবে যে, ভেকের পশ্চাতে সর্প, সর্পের পশ্চাতে শিখী, শিখীর পশ্চাতে শৃগাল, শৃগালের পশ্চাতে সিংহ, সিংহের পশ্চাতে ব্যাধ, ব্যাধের পশ্চাতে কালপুরুষ, তাহার জন্য দণ্ডহস্তে অপেক্ষা করিয়া আছে ? শ্যামা যে আশঙ্কায় আপনার ভ্রাতৃজায়াকে একাকিনী অসহায়ে মাঠের মধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলিয়া আসিল ; সে আশঙ্কা, সে বিপদ, তাহার পশ্চাতেও শত শত আকারে বিরাজমান ছিল, সে তাহা দেখিতে পাইল কৈ ? যে অধিকারী তাহার ভাবী বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিল,—যে অধিকারীকে শ্যামা আপনার আশ্রয়-ভবন রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়াছিল,—দুই দিন পরে সেই অধিকারীই কালসর্প হইয়া শ্যামার বক্ষে দংশন করিতে অগ্রসর হইল। একদিন রাত্রে একটী চটিতে যাত্রাগণ ঘুমাইয়াছে ; শ্যামাও এক পার্শ্বে ঘুমাইতেছে।

সহসা কে যেন তাঁহার গাত্রে হস্তস্পর্শ করিল! শ্যামা চমকিয়া শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যাত্রিদলপতি শ্যামার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"শ্যামা! চুপ কর—চুপ কর! একটা কথা বলিব—তাই ডাকিতেছি।" এই বলিয়া দলপতি, শ্যামাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শ্যামা কোনও কথাই শুনিতে চাহিল না। শ্যামা কাঁদিয়া চেঁচাইবার চেষ্টা করিল; দলপতি সান্ত্বনা-দানের প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল ফলিল না। ইতিমধ্যে পার্শ্বের একটী স্ত্রীলোক জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়াই, স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি শ্যামার কাছে আগাইয়া আসিলেন। বলিতে লাগিলেন,—"ভয় কি মা! ভয় কি মা! কোন ভয় নেই।" শ্যামা যেন স্বপ্নে দেখিতে পাইল,—বিপদভয়বারিণী লজ্জানিবারিণী দক্ষনন্দিনী সতী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। দলপতি সরিয়া গেল। সুপ্তোত্থিতা রমণীর সান্ত্বনা-বাক্যে শ্যামা অভয় পাইল। সেই গোলমালে যাত্রীদের কেহ কেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্যামার সম্ভ্রমরক্ষাকারিণী সান্ত্বনাদায়িনী রমণী, আসল ঘটনা কাহাকেও কিছু জানিতে দিলেন না। বরং তিনি এই বলিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন,—"শ্যামা স্বপ্নের ঘোরে চমকিয়া উঠিয়াছিল!" রমণীর পরামর্শ-উপদেশে শ্যামাও সে কথা তখন আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। তাহার বুক ফাটিল; কিন্তু মুখ ফুটিল না!

স্বর্ণমণি নাম্নী এক প্রৌঢ়া, কয়েক দিন হইতে এই যাত্রিদলের সঙ্গ লইয়াছিল। স্বর্ণমণি নাতি-গৌর, নাতি-কৃষ্ণ; তাহার দেহখানি লম্বা-চওড়া। বয়ঃক্রম চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু হাবভাবে আরও যেন কম-কম বোধ হয়। সে সধবা কি বিধবা, সহসা তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। পরিধানে চওড়া কালার পাছা; হাতে মোটা মোটা চুড়িগাছা তাগা। মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের মধ্যপথে স্বর্ণমণি এই যাত্রিদলে মিলিত হয়। সেও একজন পুরুষোত্তমের যাত্রী, অন্যের দলে আসিয়াও ঘটনাবশে দলভ্রষ্ট

হইয়া পিছ্‌'ইয়া পড়িয়াছে,—এমনই পরিচয় দিয়াছে। দলে মিশিয়া অবধি শ্যামার সঙ্গে যেন তাহার বড়ই মিশামিশি-ভাব। শ্যামার দাদা রামশরণ বাবুকে সে যেন চেনে, কলিকাতায় তাহারই বাড়ীর পাশে যেন রামশরণ বাবুর বাসা—চুপি চুপি সে এই সব কত কথাই শ্যামাকে জানাইয়াছিল। এমন কি, শ্যামা যদি ইচ্ছা করে, কলিকাতায় পৌঁছিয়া, শ্যামাকে তাহার দাদার নিকট সে দিয়া আসিবে,—স্বর্ণমণি শ্যামাকে এ কথা বলিতেও ত্রুটি করে নাই। আজ রাত্রের এই ঘটনায়, স্বর্ণমণি যেন কিছু চঞ্চল হইল। শ্যামার সম্ভ্রমরক্ষাকারিণী রমণীর মুখে বিশেষ কোনও কথা প্রকাশ না পাইলেও, সে কথা জানিতে স্বর্ণমণির বড় আর বাকী রহিল না। স্বর্ণমণি অনুমানেই অনেকটা জানিয়াছিল। শেষ যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকু সে কৌশলে শ্যামার নিকট শুনিয়া লইল। এমন কি, যে কথা আপন উদ্ধারকারিণী রমণীর নিকট বলিতেও শ্যামা কুণ্ঠিত হইয়াছিল, স্বর্ণমণি সে সকল কথাই "কুরিয়া কুরিয়া" শ্যামার পেট হইতে বাহির করিল। পর দিন শ্যামার সহিত অনেক ক্ষণ তাহারা কি গুজুগুজু পরামর্শ চলিল। স্বর্ণমণি শ্যামাকে বুঝাইয়া দিল,—"অধিকারী কাল সর্প। উহার সঙ্গে পথ-চলা, আর সর্পের মুখে হস্ত প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা,—উভয়ই সমান। এ দল পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, তোমার মান-প্রাণ-ধর্ম্ম কোনক্রমেই রক্ষা পাইবে না।" সে কথায়, শ্যামার মন, আবার এক নূতন ভাবনায়, নূতন চিন্তায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। শ্যামা মনে মনে স্থির করিল,—"এই অধিকারী-রূপী কালসর্পের সঙ্গে থাকা, কোনও ক্রমেই শ্রেয়ঃ নহে।" শ্যামা তখন ইষ্টানিষ্ট কিছুই বিবেচনা করিল না; সেই বিপদুদ্ধারকারিণী রমণীর সহিতও কোনও পরামর্শ করিবার যৌক্তিকতা দেখিল না। পর দিন রাত্রে শ্যামা, সেই দল ত্যাগ করিয়া, স্বর্ণমণির সহিত পলায়ন করিল। স্বর্ণমণি তাহাকে তাহার দাদার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবে, তাহার সতীত্ব-রত্ন রক্ষা পাইবে,—শ্যামার মনে কতই আশা! কিন্তু বিপদের পশ্চাতে যে বিপদ পর পর স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে,—মহাপুরুষের এ বাক্যামৃত শ্যামা তো কখনও পান করিবার

অবসর পায় নাই! সুতরাং কোন পথে কি বিপদ আছে, শ্যামা তাহার কি বুঝিবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মরিলে হয় তো সকল যন্ত্রণার অবসান হইত; কিন্তু মৃত্যু তো হইল না! নীরদা মরিয়াও মরিল না। শ্যামা চলিয়া গেল; সহযাত্রীরা ফিরিয়াও চাহিল না; কুলের কুললক্ষ্মী একাকিনী বটবৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। এ অবস্থায়, মৃত্যুই নীরদার পক্ষে শ্রেয় ছিল না কি? কিন্তু শ্রেয় তো ইচ্ছাধীন নহে! নীরদার ভাগ্যে তাহা ঘটিল কৈ? রাত্রির অন্ধকারে নীরদার সংজ্ঞাহীন ম্লানমুখ দর্শন করিয়া, সঙ্গীরা মনে করিয়াছিল,—নীরদা মরিয়াছে, অথবা একটু পরেই তাহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীর-সঞ্চারে নীরদার মৃতকল্প দেহে যেন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইল। নীরদার বাঁচিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না; কিন্তু মৃত্যু যেন তাহাকে কোল দিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

মুদিনী, ঘুম হইতে উঠিয়া ঝাঁপ খুলিয়া ঘরের বাহির হইবার সময়, সম্মুখে দেখিতে পাইল,—বটবৃক্ষতলে একটী স্ত্রীলোক শুইয়া রহিয়াছে। আর আর যাত্রীরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু একটী স্ত্রীলোক কেন শুইয়া পড়িয়া আছে? মুদিনী প্রথমে মনে করিয়াছিল,—"সচরাচর এ পথে যাহা ঘটিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। রমণী ওলাউঠায় মারা যাওয়ায়, সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে।" কিন্তু একটু স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া, তাহার সে ভ্রম বিদূরিত হইল। মুদিনী বুঝিতে পারিল,—"রমণী মরে নাই; তাহাকে রোগাক্রান্তা দেখিয়াই সঙ্গীরা পলায়ন করিয়াছে।"

মুদিনী এইবার মুদীকে জাগাইয়া তুলিল। তাহাদের মনে একটু একটু হলাহলাদ হইতে লাগিল,—বুঝি বা কতদিন পরে একটা 'শিকার' আসে পড়িল।

সেদিন শুক্রবার। সেদিন মেদিনীপুরের দিকে তাহাদের পদ্ম পিসীর যাই-বার কথা ছিল। সুতরাং সেই প্রতীক্ষায়, তখনকারমত তাহারা নীরদাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু সে পক্ষে চেষ্টা আর বড় করিতে হইল না। নীরদা আপনিই বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিবার পথে অগ্রসর হওয়ার পর হইতে জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নীরদার প্রাণের ভিতর দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল। নীরদা মনে মনে বলিতেছিল,—"আমার সকলে ফেলিয়া গেল বলিয়া, মৃত্যু তুমিও কি আমায় ফেলিয়া গেলে?" নীরদা আক্ষেপ করিয়া কহিতেছিল,—"এদেশে কি শেয়াল-কুকুর শকুনী-গৃধিনীও নাই! তাহারা কেন আমায় ছিঁড়িয়া খাইল না?" নীরদার এই প্রকার অনুশোচনার সময় তৎপ্রতি মুদিনীর সহানুভূতি-বারি বর্ষিত হইল।

তাহার অল্পক্ষণ পরে পদ্মপিসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীরদাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবেন,—পদ্মপিসীর হস্তে সেই ভার সমর্পিত হইল।

* * *

দুই তিন দিনের সেবা-শুশ্রূষায় পদ্মপিসী নীরদাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া-ছেন। একণে তিনি নীরদাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবেন। অদ্য তাহারই আয়োজন চলিতেছে। পদ্মপিসী প্রৌঢ়া, নীরদা যুবতী। পাঠকগণ! অতঃ-পর আপনারা সেই প্রৌঢ়া ও যুবতীর কথোপকথন কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন; আর তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন,—কোন পথে কি প্রকারে নীরদা বাড়ী চলিয়া-ছেন। বলা বাহুল্য, গড়-ভবানীপুর চটি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারা এখন এক সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া আড্ডা লইয়াছেন। এ সকল কথাবার্ত্তা সেখানে বসিয়াই চলিতেছে।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কেমন! বুঝলি তো?"

যুবতী।—"হাঁ।"

প্রৌঢ়া।—"মনে থাকবে তো?"

যুবতী।—"থাক্‌বে।"

প্রৌঢ়া।—"তা'হলে ঠিক বাড়ী পৌঁছে দেবো! নইলে, এ চোয়াড়ের দেশ; সাদা পথে, এদেশ থেকে জাতকুল বাঁচিয়ে ফিরে যাওয়া বড় শক্ত। বুঝ্‌লি কি না?"

যুবতী।—"বুঝেছি।"

প্রৌঢ়া এইবার পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বল দেখি, তোর নাম কি?"

যুবতী অন্যমনস্ক ছিল। সেই ভাবেই উত্তর দিল,—"নীরদা!"

প্রৌঢ়া কোপাবিষ্টা হইল। কিঞ্চিৎ রোষভাবে কহিল,—"তবেই হয়েছে! তুই সবই করেছিস্‌! এত ক'রে শিখিয়ে তার এই ফল হ'ল?"

যুবতী সলজ্জভাবে উত্তর দিল,—"না—না, ভুল হয়েছে—হীরেমণি।"

প্রৌঢ়া পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, বাপের নাম?"

যুবতী বিষণ্নস্বরে কহিল,—"ওটা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? ওটা কি আর বদলান যায়?"

প্রৌঢ়া সপ্তমে চড়িয়া উত্তর দিল,—"তবেই হয়েছে। তবে থাক তুই এখানে—যা ইচ্ছে কর। আমি চল্লেম—"

যুবতী ছলছলে চক্ষে কহিল,—"চটেন কেন? বলছি—বলছি।"

শিক্ষাচ্ছলে প্রৌঢ়া কখনও চোখ রাঙাইতেছে, কখনও মিষ্ট বলিতেছে, কখনও ভয় দেখাইতেছে, কখনও বা একদম স্বর্গে তুলিতেছে। মাঝে মাঝে প্রশ্নগুলি পর-পর পরতাল দিয়া লইতেছে।

প্রৌঢ়া হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সংসারে তোর আর আপনার বল্‌বার কেউ আছে?"

যুবতী এবারও অন্যমনস্ক ছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমার যে সকলই আছে! অমন দেবতার মতন স্বামী, অমন কৌশল্যার মতন শাশুড়ী—"

"আরে ম'লো যা! আমি কি এতক্ষণ এই কাঁদুনী কাঁদ্‌তে শিখালাম? আমি বললাম,—বলবি— আমার আপনার লোক আমার কেউ নেই।' তা না, এ আবার কি ঢং।"

"ওগো! না—না, আমায় আর যা বলাবে, আমি সব বল্‌তে পারবো; কিন্তু তাঁদের অমঙ্গল—আমি প্রাণ থাকতে—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; অশ্রুজলে যুবতীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

প্রৌঢ়া, বেগতিক বুঝিয়া, সান্ত্বনা আরম্ভ করিলেন; কহিলেন,—"বাছা, অমন অবোধের মত হলে চল্‌বে কেন? আমি তোমার মন্দের চেষ্টা করছি, না ভালর জন্যই এমন করছি? ভাব দেখি, যে অবস্থায় তোমায় সবাই ফেলে রেখে গিয়েছিল, আমি যদি না দেখ্‌তাম, তা'হলে তোমার কি দশা হ'ত? শেয়াল-কুকুরেই যে টেনে খেত? বিদেশ-বিভুঁয়ে অজানা-অপরিচিত লোকে— এতটা কে কার করে থাকে বল দেখি? এতটা করে বাঁচিয়েছি বলেই, আমার একটা মায়া হয়েছে; আর সেই মায়ার বশেই তোমায় বাড়ী পোঁছে দিতে চেষ্টা হচ্ছে। তা' এতেও যদি তুমি আমার কথা না শোন, তবে আর কি বল্‌বো?"

সান্ত্বনার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়া কিঞ্চিৎ অভিমানও প্রকাশ করিলেন। অবলার হৃদয়—কতক্ষণ সে বেগ ধারণ করিতে পারে? যুবতী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে উত্তর করিল,—"ও সব কথা মনে করতে গেলে, আপনা-আপনিই যে কান্না আসে—তা আমি কি করবো?"

"কচি খুকী তো নও আর তুমি এখন যে, তোমাকে বুঝিয়ে মানুষ করবো? নিজের ভাল নিজে যদি না বোঝ, কে আর বুঝাতে পারে?"—কিঞ্চিৎ দুঃখের ভান প্রকাশ করিয়া, প্রৌঢ়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আপনা-আপনিই বলিল, "হায়! ধর্ম্মই যদি রক্ষা করতে না পারলাম, তবে আর কেন সে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তুচ্ছ প্রাণটা বাঁচালাম?"

প্রৌঢ়া আরও বুঝাইল,—"ভাল, যে যে কথায় তোমার দারুণ মনঃকষ্ট হয়,

সে সব কথা তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করলে, আমিই তার উত্তর দিব। সে উত্তরে তুমি কোনও আপত্তি করো না। তবে নামটা, আর বাড়ী-ঘরের কথাটা বদলাতে হবে,—এটা যেন ভুল না হয়।"

সহানুভূতি-বারি-সেচনে প্রাণটা যত আর্দ্র হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। যুবতী এবার বলিল,—"আচ্ছা, আমি তাই-ই বলবো। যা' যা' শিখিয়ে দেবেন, তার এক বিন্দুও নড়-চড় হবে না! যে যায়গায় যে যে কথা বল্‌তে হবে, আমি ঠিকই বল্‌বো। আমি ঠিক বল্‌ছি—এর আর ব্যত্যয় হবে না। তবে তুমি যেন আমায় ছেড়ে যেও না—আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।"

"পাগলী। আমি কি তোর তেমন মা? তোর প্রাণ আমার প্রাণ কি ভিন্ন? এই বলিয়া, প্রৌঢ়া, যুবতীর প্রতি আদরের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। প্রৌঢ়া পদ্মপিসীর হস্তে পড়িয়া, যুবতী নীরদার কি দশা হইতে চলিল, পাঠক ইহাতেই তাহা বুঝিয়া লউন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামশরণ বাবুর জননী আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়িনী। দারুণ দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় বৃদ্ধা জ্বর-গ্রস্ত হন। সেই জ্বর আজ বিষম বৃদ্ধি।

পুত্র রামশরণকে দুই তিন খানা পত্র দেওয়া হইল; পুত্র বাড়ী আসিলেন না। পুত্রবধূ ও কন্যা পুরুষোত্তমে গেলেন; তাঁহারাও আর বাড়ী ফিরিলেন না। মৃত্যুকালে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; বৃদ্ধার আপশোষের আর অবধি আছে কি?

রাত্রি প্রহরাতীত। বুঝি—রাত্রি কাটে কিনা! বাড়ীর বাহিরের উঠানে বসিয়া তিন চারি জনে তাই পরামর্শ করিতেছে। ভাবনার আদি-অন্ত নাই।

বিশেষ চিন্তাবিত-স্বরে প্রবীণ শিবরাম-খুড়া কহিলেন,—"নাড়ি যেরূপ দুষ্টি দেখ্‌ছি, এই জ্বরটায় কি হয়, বল্‌তে পারি না।"

যুবক সুরেশচন্দ্রের কথা যেন কানে লাগিল না সুরেশচন্দ্র এ বাধা দিয়া কহিলেন,—" টনটনে জ্ঞান—আজকাল যে ওঃ কিছু হয় আমার গো এমনটা মনে নেয় "

শিবরামের ধারণা, ।। মত হাত দেখিতে পারে, এমন লোক এ অঞ্চলে দ্বিতীয় নাই। সুতরাং র প্রতিবাদে মনে মনে একটু চটিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—" মান বাপু, ঐ দেখে দেখেই আমার চুল পেকে গেল। ও সব রোগে, কথা ক হইতে, জ্ঞান থাকতে থাকতে, কাজ রফা হয়। ঐ যে পেট ফোলা দেখছ- বনার পেট ফোলাই বল, আর যা'ই বল—ঐ হচ্ছে কাল। এদিকে নাড়ি থাকবে টনটনে, কথা কইবে সজ্ঞানে, সব চলবে ঠিক; কিন্তু সময় হ'য়ে এলে ঐ পেট-ফোলার সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁ করে একেবারে দম-বন্ধ হ'য়ে আসবে। তখন আর শিব-সাক্ষাৎ এলেও দু'দণ্ড ধরে রাখতে পারবে না। তোমরা সব ছেলেমানুষ; তোমরা কি জান বাপু—ঐ দেখে দেখেই আমি পেকে ঝুণ হয়ে গিয়েছি—বেশী আর কি বলবো?"

শ্যামাচরণ-ভায়া, প্রৌঢ়ের মধ্যেও আপনাকে কিঞ্চিৎ অধিক-বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করিয়া থাকেন। শিবরামের কথাটা তাঁহার বড়ই মনে ধরিল; কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হইতে না হইতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ঠাকুরদা যা বলছেন, তাই-ই ঠিক। ঝাঁ করে দম আটকাবে, আর বুড়ীও দিবে ফুকরে। আমার মতে, যা থাকে অদেষ্টে, এখনই কথাটার সূচনা করা ভাল। শেষ ঘরে মারে থাকবে বুড়ী!"

বৃদ্ধার কিঞ্চিৎ নিকট-সম্পর্কীয় যুবক হলধরচন্দ্র কিন্তু সে কথায়ও বাধা দিয়া বলিল,—"যেরূপ ভাবগতিক, এখন কিছুতেই মরছে না। আপনারা অত উতলা হবেন না। সময় হলে, আমি বলবো তখন আপনাদের। কয়েক মাস কলিকাতার 'ক্যাম্বেল স্কুলে' চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন! সুতরাং তাহার বিশ্বাস, জীবন-মরণের কথা তিনি যতটা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, তেমনটী আর কেহই পারে না। তিনি কথায় কথায় এমনও কহিলেন যে,—হাসপাতালে

তিনি অমন রোগী অনেক দেখেছিলেন; এ বিষয়ে, তাহার ভূয়োদর্শন সম্বন্ধে ডাক্তার রুতার সাহেব পর্য্যন্ত বিশেষ প্রশংসা করিতেন।"

শিবরাম-খুড়া কহিলেন,—"ভাল, বুড়ীর মতটা একবার নিলে হয় না কি? একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না কেন—গঙ্গাস্নান যেতে ওঁর ইচ্ছা আছে কি না।"

শ্যামাচরণ-ভায়া তাহাতে উত্তর করিলেন,—"সে চেষ্টারও আমি ত্রুটি করি নাই। আঁচে-ওঁচে কোনও কথা তুললে, বুড়ী অমনি ব'লে ব'সে—কোন ভয় নেই, আমার শরণকে আসতে চিঠি দেও, শরণকে না দেখে আমি মরচি-নে। তোমাদের কোনও ভাবনা নেই!"

নাড়ীর অবস্থা খারাপ, অথচ বৃদ্ধা স্পষ্টতঃ বলিতেছেন,—"আমার এখন কিছু হবে না। আমার শরণকে আস্তে পত্র দেও। শরণ না এলে, আমায় গঙ্গাযাত্রা করো না।"

বাঁড়ুয্যেদের ন-গিন্নী, ঘোষেদের বড়-বউ, নন্দের মা, শ্যামার বোন, বগলা-সুন্দরী ইত্যাদি প্রতিবেশিনীগণও বৃদ্ধাকে দেখিবার জন্য অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও মত—"গঙ্গাযাত্রা করান হউক; কাহারও মত—"রামশরণ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হউক।" পচির-মা কহিল,—"তের-কেলে বুড়ো, যদি ঘরে মারা পড়ে, তা হলে আর মুখ দেখান যাবে না। যিনিই যা বলুন, আমার কথা যদি শুনতে হয়, এখনই গঙ্গাযাত্রা করা উচিত।" কিন্তু বগলাসুন্দরী কহিলেন,—"ঘাটে গিয়ে যদি এখন কিছু কাল বেঁচেই থাকে, শেষ যদি আবার বাড়ী ফিরিয়েই আন্‌তে হয়, তা'হলে যে আর নিন্দের অবধি থাকবে না। তিন ক্রোশ তফাতে গঙ্গা; সঙ্গেই বা থাকবে, তেমন লোক কোথায়?" ফলতঃ পুরুষমহলেও যেরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল; অতঃপর স্ত্রী-মহলেও সেইরূপ বাদ-বিচার চলিতে লাগিল। কি করা কর্ত্তব্য—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তাহার মীমাংসাই হইল না।

ভৃত্য নবীনদাস কবিরাজ-বাড়ী গিয়াছিল। ইতিমধ্যে কবিরাজ মহাশয়কে

সঙ্গে লইয়া সে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন সকলেই এক মত হইয়া কহিলেন,—"কবিরাজ মহাশয় যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

কবিরাজ মহাশয় দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। নিকটবর্ত্তী পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রভূত পশার-প্রতিপত্তি আছে। তিনি যেমন নাড়ী দেখিতে জানেন, তিনি যেমন নিদান-শাস্ত্র বুঝেন, তিনি যেমন রোগ নির্ণয় করেন, তেমনটী আর কোথাও কেহ পারে নাই,—তাঁহার চেলাদের মধ্যে অনেকেরই এই বিশ্বাস। কাহারও কাহারও মতে, পূর্ব্বজন্মে তিনিই সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী ছিলেন, অধুনা শাপভ্রষ্ট হইয়া এই আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন,—"ছয় মাসের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইবে কি না—কবিরাজ মহাশয় নাড়ীর গতি দেখিয়াই তাহা নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারেন।" কিন্তু এ সংসারে তো ঈর্ষাপর ব্যক্তিরও অভাব নাই! কবিরাজ মহাশয়ের এতাদৃশ সুখ্যাতি সত্ত্বেও, নিন্দকগণের রসনা তৎসম্বন্ধে নীরব নহে। ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন,—"কবিরাজ তো কবিরাজ! 'জন্ম মৃত্যু বিয়ের কথা, বলতে নারে স্বয়ং বিধাতা।' যে সম্প্রদায় বিনা পয়সায় কবিরাজের নিকট ঔষধ-পত্র পায়; তাই তাহারা তাঁর মিথ্যা প্রশংসাবাদ করে পশার বাড়িয়ে থাকে।" এই বলিয়া, গ্রামের কোন রোগীর মৃত্যুর কথা কবিরাজ বলিতে পারেন নাই,—তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়া দেয়। এ পর্য্যন্ত কত রোগী কবিরাজ মহাশয়ের হাতে মরিয়াছে, তাহারও লম্বা-চওড়া সত্য-মিথ্যা একটা তালিকা বাহির করিয়া বসে। যাহা হউক, সংসারে সর্ব্বকালে 'সু' ও 'কু' দুই সম্প্রদায়ের লোকই বিদ্যমান আছে সুতরাং সে সকল কথা বৃথা আলোচনায় আর ফল কি? সে নিন্দা সুখ্যাতিতে এ পর্য্যন্ত কবিরাজ মহাশয়ের কিছু আসে-যায় নাই। তিনি যেমন, তেমনই আছেন; তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি কিছুই কমে-বাড়ে নাই। কবিরাজ মহাশয়ের নাম—হরচন্দ্র কবিচিন্তামণি। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। আকৃতি স্থূল ও দীর্ঘ।

কবিরাজ মহাশয়ের আদি-নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে—বিক্রমপুরে। তিনি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এক্ষণে বর্দ্ধমান-জেলায় আসিয়া চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এখন ঐ জেলাতেই তাঁহার বাস হইয়াছে বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। রামশরণ বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ। রামশরণ বাবুই তাঁহাকে আনিয়া সে গ্রামে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং রামশরণ বাবুর জননীর সঙ্কট পীড়ার সংবাদ শুনিয়া, রাত্রিতেই তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। অন্য কোথাও যাইতে হইলে, সে রাত্রে তিনি কদাচ যাইতেন না। কেবল রামশরণ বাবুর খাতিরেই তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন; বহুতর শাস্ত্রীয় প্রবচন আবৃত্তি করিলেন; বায়ু-পিত্ত-কফ—ত্রিবিধ প্রকোপের পরিচয় দিলেন। শেষ কহিলেন,—"অদ্য রাত্রে চিন্তার বিশেষ কারণ নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে গঙ্গাযাত্রার পক্ষেও শুভলগ্ন নহে।" এই বলিয়া, কবিরাজ মহাশয় একটী জ্যোতিষ-বচন আবৃত্তি করিলেন। তারপর তিনি আরও কহিলেন—"আগামী কল্য কলিকাতায় রামশরণ বাবুর নিকট পত্র পাঠান হউক। তিনি যাহাতে পত্রপাঠ আগমন করেন, তদ্বিষয়ে আমারও বিশেষ অনুরোধ জানাইতে হইবে তাঁহার জননীর পুত্র-মুখ-দর্শন-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখা কোনক্রমেই শ্রেয়ঃ নহে। মাতা-পুত্র উভয়ের পক্ষে উহা অশুভকর।"

অতঃপর তাহাই স্থির হইল। "রামশরণ বাবুর বাড়ী আসা চাই"—কবিরাজ মহাশয় সকলকেই তজ্জন্য চেষ্টা করিতে কহিলেন। তিনি পরদিন পুনরায় আসিয়া দেখিয়া যাইবেন—বলিয়া গেলেন। ঔষধের মধ্যে রাত্রে দুইবার "বৃহৎ কস্তুরী-কল্প-রসায়ন" দুই মাত্রা সেবন করাইবার ব্যবস্থা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কিছুতেই কথা শুনলে না?"

"কিছুতেই না। লোভে ভুলুতে পারলেম না। ভয় দেখিয়ে পারলেম না! মার-ধোর করেও কিছু হ'ল না।"

"তবে কি ভাবে আছে এখন?"

"ঐ দেখ-না—পড়ে রয়েছে! খ'ওয়া নেই, শোওয়া নেই, নিদ্রা নেই—দিন রাতই কেবল কান্না! আমার এতগুলো টাকা—সব জলে গেল!"

"আচ্ছা, কারুর কাছে যেতে চায় না?"

"বল্‌বো কি সে দুঃখের কথা দিদি! আহা—প্যালা মিত্রের ছেলে—ছোঁড়ার যেমন চেহারা, তেমনি রঙ, তেমনি বাপের পয়সা—তার সম্পূর্ণ নজর ওর দিকে! পান্নামল জহুরী—সে বেটা যেন পাগল ওর জন্যে! কিন্তু হ'লে কি হবে? সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'লো—এত যোগাড়-যন্ত্র সব ভেসে গেল!"

"আচ্ছা, বলে কি?"

"বল্‌বে—আমার মাথা, আর আমার মুণ্ডু। কথার মধ্যে কেবল—'কৈ, দাদার বাসাটা আমায় চিনিয়ে দিলে না?'—মার-ধোর কর্‌লে যখন নিতান্ত কষ্ট হয়, তখন হদ্দ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বলে—'উঃ—বড় যন্ত্রণা—আমি এখনও মলেম না!' ছুঁড়িটার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো অবাক্‌! লোভে ভুল্‌লো না, গালিগালাজে ভয় নেই, যন্ত্রণায় ভয় নেই। এ বয়সে আমি অনেক দেখেছি, অনেককে ঠিক্‌ করেছি; কিন্তু এমনটী কখনও দেখি-নি। আমি যে আমি—আমিও ওর কাছে হার মানলেম!"

"আচ্ছা, কি ক'রে ওকে পেয়েছিলে?"

"সে কথা আর কি বল্‌বো—সে অনেক কথার কথা! তা না হলে কি আর অত সস্তাদরে অমন একটা মেয়ে পাওয়া যায়? শুনতে পাই, ওরা দুই ননদ ভাজ—বাড়ীর কর্ত্তাদের লুকিয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে যায়। সঙ্গে ওদের

গাঁয়ের আরও যাত্রীরা সব ছিল। যাবার সময় জাহাজে গিয়েছিল—আসবার সময়েও জাহাজে আসবার কথা ছিল। কিন্তু আসবার সময় জাহাজে বড়ই ভিড়। ভিড়ে জাহাজে ওরা উঠ্‌তেই পারে না। তাড়াতাড়িতে জাহাজ ছেড়ে দেয়—সঙ্গের সাথীরা সব চলে আসে। পয়সা-কড়িও তেমন সঙ্গে ছিল না; এদিকে হাঁটাপথে যাত্রীরা আস্‌ছিল; সুতরাং তাদের সঙ্গেই দেশে ফিরবার জন্য রওনা হয়।"

"তার পর?"

"তার পর, পথে, ওলাউঠাতে বোউটা মারা যায়। ও আর কি করবে? কাজেই যাত্রীদের সঙ্গে দেশে আসবার চেষ্টা করে। তার পর, যাত্রী ধরা যাদের কাজ, তাদের কথা তো আর তোমার অজানিত নেই। মধ্যে থেকে, মেদিনীপুরের পথে সোনা দিদি জুটে যায়; সেও একজন পুরুষোত্তমের যাত্রী, আগের দলে এসেও ঘটনাবশে দলভ্রষ্ট হয়ে পিছিয়ে পড়েছে—এমনই পরিচয় দেয়। সোনা-দিদি যেমন মিশুক—সে যেমন জহুরী, তা তো আর তোমার অবিদিত নেই! সকলের পেটের কথা টেনে বার করে নিতে, তার মত আর কে আছে? সময়মাফিক, সুযোগ বুঝে, সে একদিন প্রস্তাব করে,—'ও রামশরণ বাবু! তাঁকে আমি চিনি। আমাদেরই বাড়ীর কাছে তাঁর বাসা। তা' আমিই তোমায় পৌঁছে দেব—চিন্তা কি?' ছুঁড়ীর পক্ষে সেই-ই হ'ল কাল। তারপর যা যা' হয়েছে, তা' তো তুমি শুনেছই।"

সন্ধ্যা হয়-হয়—ঠিক এমন সময়, কলকাতার একটী বেশ্যাপল্লীতে বাড়ীর ভিতরের বারাণ্ডায় বসিয়া, দুইটী স্ত্রীলোকে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। একের নিকট অপরা পরামর্শ লইতে বসিয়াছে। যাহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহাকে বোধ হয় পাঠকের চিনিতে আর বাকী নাই। সে শ্যামা—শ্যামা বেশ্যালয়ে বিক্রীত। শ্যামাকে 'নষ্ট' করিবার জন্য এই ঘোর চক্রান্ত চলিয়াছে। যাহা হউক, সকল কথা শুনিয়া, পরামর্শদাত্রী কহিল,—"বুঝেছি, আমি সব বুঝেছি। শুধু আঙুলে আর ঘি গলচে না। ওকে

নিয়ে আর সোজা-পথে কাজ চল্‌বে না। এখন আমাদের নিজ মূর্ত্তি ধরা চাই।”

পরামর্শ-প্রার্থিনী কহিল,—“যা’হোক বোন, তোরা আছিস্‌ পাঁচ জন, দেখ দেখি—যদি কিছু করতে পারিস্‌। আমি তো হাল ছেড়েই দিয়েছি একেবারে।”

“কোন ভাবনা নেই—সন্ধ্যের পর আজই এর বিহিত করা যাবে এখন! আজ আমি শিকড় ধরে টান দেবো—দেখি কোথায় যায়? বেটি বদ্‌মায়েসের জড়; মার ধ’রে ওর কি কিছু হয়? যার জন্যে ওর এত ডিট্‌কেল্‌মি, আজ আমি ওর তাই খোয়াবো। আর, তা’ না হলেও, ও বেটী জব্দ হবে না কিছুতেই! ও যে সতীত্ব-সতীত্ব ক’রে প্রাণপণ করেছে, সেইটি গেলেই ওর দড় ভাঙ্‌বে জানিস্‌ আমি আজ ওর তারই মাথা খাবো আগে; তার পর অন্য কথা!”

“তা বোন!—যা করতে হয়, কর। তোমারই উপর সব ভার আমার! বেটীর গুমোরট একবার ভাঙ্‌তে পারলেই হয়।”

পরামর্শদাত্রী কহিল,—“কোনও চিন্তা নেই। রাত্রি নটার পর আমি আবার আস্‌বো। আমার সঙ্গে একটা গুণ্ডা ছোঁড়াকে নিয়ে আসবো। তাকে আর ওকে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। তার পর যা যা করতে হয়, সেজন্য কোনও ভাবনা নেই; আমি এমনতর অনেক বেটীকেই সোজা করে এনেছি।”

পরামর্শপ্রার্থিনী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কাকে আন্‌বে মনে করছো?”

পরামর্শদাত্রী উত্তর দিল,—“সেই যে যণ্ডা গুণ্ডা সুশ্রী বামুনের ছেলেটা আমায় মাসী মাসী করে ডাকে, একটু খাঁটি-মাটি টানিয়ে, তাকেই এনে হাজির করবো এখনই। সে বেটা আমার ভারি বশ! দুটো মিষ্টি কথা বল্‌লেই সব কাজ সে করবে এখন। তার তো আর তিনকুলে কেউ নেই। তার দ্বারাই ঠিক কাজ হতে হবে। না হয়, আরও আছে।”

এই বলিয়া, পরামর্শদাত্রী তখনকারমত বিদায় গ্রহণ করিল। স্থির

রহিল,—রাত্রি নয়টার পর একটা গুণ্ডা যুবককে সঙ্গে লইয়া, সে পুনরায় ঐ বাড়ীতে আসিবে; এবং তখন দেখিবে—কি করিয়া শ্যামা সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

সাত দিন হইল, শ্যামা বেশ্যালয়ে বিক্রীত হইয়াছে। প্রথম দিন কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তাহার পুরুষোত্তম-পথের সঙ্গিনী স্বর্ণমণি যেদিন প্রথম তাহাকে রাখিয়া গেল, শ্যামা মনে করিয়াছিল, সেইদিনই সে তাহার দাদার বাসায় পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু দিন কাটিল, রাত্রি আসিল; শ্যামাকে তো তাহার দাদার বাসায় কেহ পৌঁছিয়া দিল না! তাহার আশা-আশ্বাস-ভরসার স্থল সেই স্বর্ণমণিকেও শ্যামা তো আর দেখিতে পাইল না! শ্যামাকে এই বাড়ীতে রাখিয়া যাইবার সময়, স্বর্ণমণি বলিয়া গিয়াছিল,—"তোমার দাদা সন্ধ্যার পর আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।" কিন্তু সে সংবাদ লইয়া স্বর্ণমণি তো আর প্রত্যাবৃত্ত হইল না। সেদিন সেরাত্রি স্বর্ণমণির প্রত্যাগমনের চিন্তাতেই অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে স্বর্ণমণির ভগীর নিকট শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল,—"কৈ দিদি! সোণামণি তো আমার দাদার বাসায় পৌঁছে দিল না?" বলা বাহুল্য, স্বর্ণমণি যাহার নিকট শ্যামাকে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহাকে আপনার ভগী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তাহার সেই ভগীর নাম—হরিমতি। শ্যামার প্রশ্নের উত্তরে হরিমতি শ্যামাকে কহিল,—"সোণাদিদি আসিয়াছিল; আমাকে বলিয়া গিয়াছে, তোমার দাদাকে সে রাজী করিতে পারে নাই। তোমার দাদা তোমার উপর বড়ই চটিয়া আছেন। তাহার রাগ একটু থামাইয়া, সে

তোমাকে তোমার দাদার নিকট দিয়া আসিবে।" দ্বিতীয় দিনও সেই সন্দেহ-সংশয়ে কাটিয়া গেল। শ্যামার আর দাদার বাসায় পৌঁছান হইল না। তৃতীয় দিন শ্যামা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল,—সে এখন কি অবস্থায় কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে!

এই দিন হইতেই শ্যামার উপর ভয়-ভরসা প্রলোভনের কুহক-জাল বিস্তৃত হইল। হরিমতি বুঝাইতে লাগিল,—"সমাজে স্বগৃহে শ্যামার আর স্থান নাই। শ্যামা বেশ্যালয়ে বিক্রীত হইয়াছে; নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ হইলেও, সমাজ তাহাকে কখনই গ্রহণ করিবে না।" শ্যামার দাদা যে আর শ্যামার মুখ দেখিতে রাজী নহেন,—হরিমতি সে কথা কহিতেও ত্রুটি করিল না। তার পর ভরসা দিল,—"শ্যামার ভাবনা কি? হরিমতি যদি খাইতে পায়, শ্যামা অবশ্যই এক মুঠা খাইতে পাইবে।" আরও প্রলোভন দেখাইল,—"হরিমতির যাহা কিছু আছে,—বাড়ী, ঘর, গহনা, আসবাব,—সমস্তই সে শ্যামাকে দিবে। শ্যামা তাহার কন্যা বলিয়া পরিচিত হইবে।"

শ্যামা এই সকল কথা যতই শুনিতে লাগিল, ততই যেন তাহার বক্ষে শত বৃশ্চিক-দংশন আরম্ভ হইল। শ্যামা এক একবার হরিমতির চরণতলে পড়িয়া কাঁদিয়া নয়নজলে ভূমি ভাসাইয়া দিতে লাগিল। শ্যামা এক একবার বিনয় করিয়া কহিল,—"আমার কোনও সুখৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন নাই; আমায় বাড়ী দিয়ে এস।" শ্যামা এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া করুণ-কণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—"হে ভগবান্! আমায় এ কোথায় আনিলে? আমায় এ কি করিলে!" শ্যামার আপ্‌শোষের আর অবধি রহিল না। শ্যামার সে মর্ম্ম-ভেদী ক্রন্দনে হয় তো পাষাণ বিগলিত হইত! কিন্তু হরিমতির হৃদয় বুঝি বা পাষাণের অপেক্ষাও কঠোর-কঠিন! হরিমতি শ্যামার কোনও কথায়ই কর্ণপাত করিল না। কখনও সে ভয় দেখাইতে লাগিল; কখনও বা স্নেহ-প্রকাশ করিল; কখনও বা আপনার ঐশ্বর্য্যাদির প্রলোভন দেখাইল।

এই অবস্থায়, এইরূপ ভাবে, সাত দিন কাটিয়া গেল। শ্যামার আহার নাই,

নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। শ্যামা দিন-রাত্রি কেবলই ভাবে, কেবলই কাঁদে, কেবলই হাহাকার করে। শ্যামা কখনও মনে করে,—"হায়! কি করিলাম!" শ্যামা কখনও মনে করে,—"পলাইয়া যাই।" শ্যামা কখনও মনে করে,—"আত্মহত্যা করি!" সাত দিন কাল, শ্যামার চিন্তার অবধি নাই। দুশ্চিন্তা দিন দিনই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসা অবধি একে একে এখন সকল কথাই শ্যামার মনে পড়িতেছে। শ্যামা ভাবিতেছে—"দাদার মত না লইয়া, উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিয়া, কেনই বা তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম? কেনই বা, কিসের মমতায়, প্রাণের ভ্রাতৃজায়াকে মাঠের মধ্যে অসহায়ে একাকিনী ফেলিয়া আসিলাম? আর কেনই বা সোনামণির প্রলোভনে ভুলিয়া, সঙ্গীদিগকে—বিশেষতঃ আমার সম্ভ্রম-রক্ষাকারিণী সেই জননীকে—পরিত্যাগ করিয়া, এই নরকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম?" শ্যামা একবার ভাবিতেছে,—"পলাইয়া যাই!" কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছে,—"কোথায় পলাইব? পলাইবার স্থান আমার আর কোথায় আছে? চারি দিকেই রাক্ষস-রাক্ষসী আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; আমি পলাইয়া কোথায় পরিত্রাণ পাইব?" শ্যামা তখন ভাবিতেছে,—"আমি মরি না কেন? মরিলেই তো আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়?" শ্যামা আপনা-আপনিই চিন্তা করিতেছে—"তবে কি ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িব?" আবার আপনা-আপনিই মীমাংসা করিতেছে,—"কিন্তু হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়াও যদি মৃত্যু না হয়!" তাই আবার ভাবিতেছে,—"তবে কি গলায় কাপড় জড়াইয়া গলায় ফাঁস দিয়া মরিব? কিন্তু তাহাতেও সংশয় হইতেছে,—"যদি না ফাঁস দৃঢ় হয়!" তার পর আরও মনে হইতেছে,—"মরিব কি প্রকারে? আমার প্রতি তাহাদের যে প্রখর দৃষ্টি, তাহাতে আমার মরিবারই বা অবসর কৈ? মরিতে গেলে, উহারা এখনই যে আমায় ধরিয়া ফেলিবে। সে যে আবার বিপদের উপর নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে।" শ্যামা আরও মনে করিয়াছিল,—"অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে।" কিন্তু হরিমতির কৌশলবলে তাহার সে সঙ্কল্পও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

হরিমতির বাড়ীতে আসিয়া, প্রথম দুই দিন শ্যামা স্ব-পাকে অন্নাহার করিয়াছিল; তৃতীয় দিন হইতেই সে আহার বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু হরিমতি এখন তাহাকে ভুলাইয়া দুগ্ধাদি পান করাইয়া জীবিত রাখিয়াছে। ফলতঃ কোনও ক্রমেই শ্যামার আর মরা হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

আজ সপ্তম দিবস। হরিমতি আজ একবার শেষ দেখা দেখিবে। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে আজ তাই স্থির করিয়াছে,—জোর করিয়া গুণ্ডার দ্বারা শ্যামার সতী-ধর্ম্ম নষ্ট করিবে। ইতিপূর্ব্বে পাঠক যোগাড়-যন্ত্র দেখিয়াছেন; এইবার কার্য্যপরম্পরা লক্ষ্য করুন।

শ্যামা কোনও কথাই কিছু শোনে নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে তাহার প্রাণের ভিতরে কি যেন বিষম বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে। শ্যামার বড় ভয় হইতেছে। শ্যামার বড়ই ভাবনা হইতেছে। সে একাকিনী একটী ঘরের মধ্যে পড়িয়া আছে; আর এক একবার যেন চমকিয়া উঠিতেছে। শ্যামা মনে মনে ডাকিতেছে—"হে বিপদ-ভয়বারণ!—একবার আমায় এ বিপদে উদ্ধার কর। হে পাপবিমোচন নারায়ণ!—তোমার নাম স্মরণেই সকল পাপতাপ বিদূরিত হয়; আমি অবলা অসহায়া নারী, অহর্নিশ তোমায় একমনে ডাকিতেছি; আমার পাপ কি দূর করিবে না? হে লজ্জানিবারণ শ্রীমধুসূদন!—তুমি কৌরব-সভায় বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া অসহায়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে; আজ আমি ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমায় প্রাণে প্রাণে ডাকিতেছি, আমার লজ্জা নিবারণ কর শ্রীহরি!" শ্যামা, কত ভাবে, কত নামে, কতই কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ভগবানকে ডাকিতেছে। ডাকিতেছে—"ভগবান্! রক্ষা কর।" ডাকিতেছে—"জগদ্বন্ধু জগন্নাথ! তুমি আমার রক্ষা কর!"

রাত্রি গম্‌গম্‌ করিতেছে। চারিদিক 'নিঝুতি'।

"আস্তে—আস্তে!"

দূর হইতে দুই জনে ঘর দেখাইয়া দিয়া, তফাতে সরিয়া গেল। একটী যুবা-পুরুষ, আঁধারে আঁধারে আসিয়া, শ্যামার ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে যুবক ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে শ্যামার দিকে অগ্রসর হইল।

"কে—কে তুমি ?"

শ্যামা চমকিয়া উঠিল,—"কে—কে তুমি ?"

পরক্ষণেই উন্মত্তভাবে বলিতে লাগিল,—"একি—একি! কে—কে তুমি ?"

শ্যামা কাঁপিতে লাগিল।

"তুমি!—তুমি এখানে ?"

যুবক সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"তুমি!—তুমি এখানে ?"

শ্যামা আরও কাঁপিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বর-বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

যুবক বিস্ময়-বিজড়িত-কণ্ঠে উদ্বেগের সহিত এইবার বলিয়া উঠিলেন,— "শ্যামা—শ্যামা!—তুমি এখানে ? তুমি এখানে কেমন করে এলে ?"

শ্যামা, বিস্ময় সহকারে, ভীতি বিহ্বল-স্বরে, বলিয়া উঠিল,—"একি দেখি! ম!—তুমি!—সত্যই কি তুমি ? তুমি কি এখনও বেঁচে আছ ?—না, ভূত হয়েও আমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে এসেছ ?"

যুবক কম্পিত-কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—"শ্যামা!—শ্যামা!—আমি ভূত নই!—দেখ, দেখ, আমি ভূত নই—আমি হৃদয়—তোমার স্বামী—"

"স্বামী!—স্বামী ?—আমার স্বামী ?—আমার স্বামী তো জলে ডুবে—"

শ্যামার কথা শেষ হইল না। যুবক, অগ্রসর হইয়া, শ্যামার হস্ত ধরিতে গিয়া,

বলিলেন,—"শ্যামা! এই দেখ, আমি ভূত নই—আমি তোমার স্বামী। আমি পদ্মায় ডুবেছিলেম বটে, মরি-নি!"

শ্যামা শিহরিয়া সরিয়া গেল।

যুবক আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি পদ্মায় ডুবেছিলাম বটে, মরি-নি। সে কথা সমস্তই এখনই বল্‌চি। তুমি একটু চুপ কর—একটু স্থির হও।"

যুবক বড়ই কষ্টের সহিত এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামার চোখের ঘোর যেন কাটিয়া গেল। শ্যামা দেখিল—এযে সত্যই তাহার স্বামী হৃদয়! শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"স্বামী? তবে তুমি আমায় রক্ষা কর—আমার বাঁচাও—আমার মান যায়, ধর্ম্ম যায়, প্রাণ যায়—আমায় বাঁচাও।"

শ্যামা উন্মাদের মত চীৎকার করিতে লাগিল।

যুবক মিষ্টকথায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"কেঁদো না!—চেঁচিও না!—তা হ'লে বিপদ ঘট্‌তে পারে। চুপিচুপি কথা কও! আর গোল-মালে কাজ নেই; তার পর যা' যা' কর্‌তে হবে, দেখি আমি বিবেচনা ক'রে।"

শ্যামা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু তখনও তাহার কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নাই। সুতরাং শ্যামা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি পদ্মায় ডুবেছিলে; তুমি কি করে বেঁচে এলে?" শ্যামার মনে তখনও সংশয়—বুঝি ভগবান্ তাহার স্বামীর প্রেতমূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিতে আসিয়াছেন।

যুবক তখন ধীরে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি কহি-লেন,—"আমার ডুবে যাওয়াটা সত্যি কথা বটে! তবে আমি মরি নাই। পার হওয়ার সময়, বিকেল-বেলা হঠাৎ একটা ঝড় উঠে নৌকাখানাকে ডুবিয়ে দেয়। আমাদের গাঁয়ের হরে কামার, কেদারে মুহুরী—তারাও সব সেই নৌকাতেই ছিল; নৌকা-ডুবির পর, কে কোথায় ভেসে যায়, কিছুই আর জান্‌তে পারি-নে;

তারাও দেখে যে, আমিও তলিয়ে গেলেম। আর সেই থেকেই দেশে রাষ্ট্র—আমি ডুবে মরেছি,। কিন্তু হায়! এই সব দেখ্‌তে হ'বে ব'লেই বুঝি—"

বলিতে বলিতে, যুবকের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। শ্যামা, একদৃষ্টে যুবকের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

যুবক, আপনা-আপনিই মনোগতি প্রতিরোধ করিয়া, আবারও বলিতে লাগিলেন,—"ডুবে ডুবেই অনেকটা দূর গিয়ে, শেষে আমি ভেসে উঠি—স্রোতে ও ঝড়ে আমায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রায় এক-কোশ দূরে একটা ঘাটে কতকগুলা নৌকা বাঁধা ছিল—আমি তারই একখানাতে গিয়ে আট্‌কে পড়ি। জ্ঞান তখন আমার খু। ছিল; আমি চেঁচিয়ে উঠি। মানুষের সাড়া পেয়ে, মাঝিরা আমায় তুলে ফেলে—গা-হাত-পা মুছিয়ে দেয়—কাপড় ছাড়ায়।"

শ্যামা জলজল-নেত্রে পাগলের মত চাহিয়া রহিল।

যুবক আরও বলিতে লাগিলেন,—"বাড়ী থেকে পালানর ঝোঁকটা আমার বরাবরই ছিল। এই নৌকা ডুবিতে সেপক্ষে আমার বড়ই সুবিধা হয়েছে বলে মনে হলো। সেই থেকেই তাই আমি নাম-ভাঁড়াই, বাড়ীর ঠিকানা বদল করে ফেলি। তার পরই আর কি—সটান গোয়ালন্দ হ'য়ে, কল্‌কাতায় চলে আসি। কারুকে খোঁজ-খবরটি পর্য্যন্ত দিই-নে; আত্মীয়-লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি-নে; কোনখানে কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভব হ'লে, মুখ ঢাকা দিয়ে পিছিয়ে পড়ি। সেই অবধি বরাবরই আমার এই ভাব। মা মরে যাওয়ার পর দাদার ও বৌদিদির ব্যবহারের কথা তো তোমার আর অবিদিত নাই। সে বাড়ীতে যেতে কি তার ইচ্ছা হয় কখনও!

এ জীবন কাটাচ্ছি। কাজের মধ্যে একরকম মুটেগিরি বল্‌লেও হয়; আর তার উপার্জ্জন—দেখ্‌ছই তো এই সম্বার!"

দারুণ আত্মগ্লানিতে যুবকের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল,—যেন তাঁহারই পাপে তাঁহার স্ত্রী এই দারুণ বিপদে নিপতিতা! যুবক মর্ম্মভেদ যন্ত্রণায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্যামা! তোমার কেন এমন হ'ল?"

শ্যামা একে একে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। বাড়ীর বাহির হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্তই সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। শেষ বলিল,—"আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও।"

তুমি চুপ কর—তোমার কোন চিন্তা নেই—আমি এখনই কোনও উপায় ঠিক্ করছি।"

যুবক গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিলেন।

শ্যামা, তাঁহার পা-দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিতে লাগিল,—"তুমি আমায় ফেলে যেও না। তুমি চলে গেলে, আমি যে আর এক দণ্ডও বাঁচতে পারবো না।"

যুবক আশ্বাস দিলেন,—"ভয় নেই—আমি আসছি। তুমি ভয় করো-না—আমার কথা শোন। আমি আগে একবার দেখে আসি, বাড়ীর কে কি অবস্থায় আছে। তারপর পুলিশ নিয়ে এসে তোমায় উদ্ধার করছি। আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি দরজা বন্ধ করে থাক।" যুবক যে অবস্থায় যে জীবন অতিবাহিত করিয়েছেন তাঁহার পক্ষে ইহার অধিক উপায়-উদ্ভাবনের আশা আর কি করা যাইতে পারে?

যুবক বহির্গত হইলেন। অপর ঘরে বাড়ীওয়ালী হরিমতি ও তাহার সহকারিণী অপেক্ষা করিতেছিল। অনেক ক্ষণ তাহাদের সহিত চুপি চুপি কি কথাবার্ত্তা কহিলেন। তারপর সম্ভবতঃ তাহাদিগকে আশ্বাস-ভরসা প্রদান করিয়া, কি একটা অছিলায় বাড়ীর বাহির হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কেহ বলিতে লাগিল,—"বেটাকে জালিয়াতে ফেলা যাক।"

কেহ বলিতে লাগিল,—"হাতে একটা ঘটিবাটী দিয়ে, চোর ব'লে পুলিশ-সোপর্দ্দ করে দেওয়া যাক!"

নবকুমার চন্দ্র, আজ পাঁচ মাস যাবৎ পেনু উকীলের মুহুরীগিরি করিয়া, আপনাকে একজন বিশেষ আইনজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিঞ্চিৎ গম্ভীর-স্বরে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অনধিকার-প্রবেশ, পরস্ত্রীর প্রতি আক্রমণ—আইনের এমন একটা ধারাতেও ফেলা যায়।"

ইতিমধ্যে, সকলের উপর টেক্কা দিয়া, শ্রীমান পরাণকৃষ্ণ চাটুর্য্যে ভায়া বলিয়া উঠিলেন,—"থানগাঁয়া-গলি-থানার রামকান্ত ইনিস্‌পেক্টার আমার সম্বন্ধীয় বোন্‌পো-জামাই। আমার সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম!—এক গ্লাসের ইয়ার আর কি? কুছ পরওয়া নেই—তাঁর দ্বারা আমি এখনই বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি! বড় জোর—দু'এক গ্লাস খাঁটির ওয়াস্তা!"

কথার সুরে সুর মিলাইয়া অবিনাশচন্দ্র কহিলেন,—"না হয় কিছু টাকাই যাবে! তার আর কি?"

হরিমতিও বলিয়া উঠিল,—"তা' বাপু, তা'তেও আমি রাজি! টাকা আমার গিয়েছে, না যেতে আছে? ও বেটাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে আমি সব কর্‌তে রাজী আছি। বেটা মিছরির ছুরি হেনেছে বুকে?"

সেই কথায় সায় দিয়া অবিনাশচন্দ্র কহিলেন,—"ঠিক বলেছ মাসী! বেটা ঠিক্ মিছরির ছুরিই হেনেছে বুকে!"

কথাটা মনোমত হওয়ায়, হরিমতি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"তার কি আর কথা আছে? আর একটু হ'লে কি আর রক্ষে থাকৃতো? ভাগ্যিস্ দুঃখীরাম জমাদারের সঙ্গে আমার সম্প্রীতটা ছিল—ভাগ্যিস্ সে এসে

খাতির-যত্ন ক'রে পান-তামাকটা খেতে দিয়ে আদর-অভ্যর্থনা করি। বল্ দেখি একবার—সে যদি এসে খবরটা না দিয়ে যেতো, তবে কি হ'তো এতক্ষণ? এ যোগাড়-যন্ত্রই বা কোথা থেকে হ'তো—আর কোথায়ই বা এতক্ষণ থাকতেম আমরা? বিশেষ, যদি রাত্রিকালেও না হ'তো, তবে তোদেরই বা কোথায় দেখা পেতেম? এই যে বেটা পুলিশে খবর দিতে গেল, পুলিশ যদি সত্যি সত্যিই এসে পড়তো, কি হতো বল দেখি? মা-বাপ কিছু বল্‌তে দিতো কি? বেটা এমন কাণ্ডটাই বাধিয়েছিলো এখনই; বেটাকে ছাই পেড়ে কাটুলেও এ রাগ যায় না?'

"ঠিক তো—ঠিক্ তো!"

আর আর যাঁহারা হরিমতির সহায়তা করিবার জন্য সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞা—বেটা যাতে জব্দ হয়। বেশীর ভাগ কেহ কেহ আবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ রকম সব ছোট-লোকদের জ্বালাতেই, এসব যায়গায়, ভদ্রলোকদেরও মান-সম্ভ্রম ক্রমে নষ্ট হ'তে চল্‌লো। দুই'এক বেটা বদমায়েস্ জুটে, আমাদের মুখে চুণকালী দিলো। এসব যায়গায় আগে আমাদের কি সম্ভ্রমই না ছিল; কিন্তু বেটাদের জ্বালায় সব গেল? দুষ্ট গরুর সঙ্গে কপিলে-গাইও বাঁধা পড়ে; আমাদেরও ক্রমে দেখ্‌ছি, তা'ই হ'তে হ'লো। এসব কি কম দুঃখের কথা!"

কেহ কেহ অমনি সুর ধরিলেন,—"এর বিহিত সুতরাং আমাদেরই করা উচিত। বেটা য'তে জব্দ হয়, তা' না করতে পার্‌লে, আমাদের আর মুখ-দেখান ভার হ'বে।"

"ঠিকই বটে—ঠিকই বটে! এর বিহিত আমাদের করা উচিত।"

সকলের মুখ হইতে একবাক্যে ঐ রায় প্রকাশ পাইল। স্থির হইল, বাড়ীওয়ালী হরিমতি গায়ে আঁচটী পর্য্যন্ত লাগিবে না, অথচ তাঁহারাই কার্য্য সমাধা করিয়া দিবেন। নিরীহ 'বাড়ীওয়ালীর' প্রতি অকারণ এক জনের এতটা জুলুম—এটা সকলেরই অন্তরে অন্তরে বিঁধিয়াছে কিনা! সুতরাং একবাক্যে সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন। রামকান্ত ইন্সিপেক্টারের সহিত যোগা-যোগে

কাজ হইবে—চাই তাতে দু'পাঁচশো লাগুক—সকলেরই সেই মত। ঘরের পয়সা খরচা করিয়াও একবার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন—সকলের এই প্রতিজ্ঞা হইল।

পরাণকৃষ্ণের পরামর্শ ই তখন স্থির হইয়া গেল। খানসামা গলির থানাতে গিয়া রামকান্ত ইনিস্‌পেক্টারের সহিত বন্দোবস্ত করাই ঠিক হইল।

হৃদয়চন্দ্র পুলিশে খবর দিতে গিয়াছেন; তারে তারে পুলিশের দ্বারাই সে সংবাদ হরিমতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হরিমতিও টাকার উপর টাকা ঢালিতে সুরু করিয়াছে; পরন্তু শ্যামার উপরও পুলিশের খরদৃষ্টি পড়িয়াছে। হরিমতি কিন্তু তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, পুলিশ তাহার নিকট সিন্নিও খাইতেছে, আবার তাহার ভরা-ডুবিরও চেষ্টায় আছে

* * *

হৃদয়চন্দ্র সে সকল সংবাদ কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি রাত্রি দুপুর হইতে ঘুরিতেছেন; কিন্তু কাজ কিছুই হইতেছে না। থানার 'গেটে' যাহার পাহারা, সে একবার আদ্যোপান্ত সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনিয়া লইল। তার জুড়িদার দুইজন—তাহারাও একে একে, আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা পর-পর শুনিয়া লইল। হেডকনেষ্টবোল আসিলেন; তিনিও ঐরূপ শুনিলেন। ক্রমে পাহারাওয়ালা-জমাদারদিগের যত বদলী যাইতে-আসিতে লাগিল, তাহারাও, একটু একটু অবসর করিয়া লইয়া, ব্যাপারখানা সব শুনিয়া লইল।

মধ্যে একবার রাইটার-বাবুর সাক্ষাৎ পাইলেন। ব্যাপারটা পর পর সব শুনিয়া, অনেক ইতস্ততের পর, তিনি বলিলেন,—"অত কথা সব ডায়েরিজাত করতে তো পারি-নে! হদ্দ এই লিখে নিতে পারি—তোমার অমুক মানুষ কাল বিকেল থেকে নিরুদ্দেশ! ২৪ ঘণ্টার আগেকার কথা লেখাতে গেলেও দোষ! লিখলেও বে-আইনে কাজ করা হয়। তবে তুমি অত করে ধরেছো, তারই খাতিরে, আমি না হয় এই পর্য্যন্ত লিখে দিতে পারি—'কাল বিকেল

থেকে তোমার মানুষ নিরুদ্দেশ।' বাস্—রাজী হও তো, সই কর—চলে যাও।"

কিন্তু হৃদয়চন্দ্র তাহাতে উত্তর দিলেন,—"সে কি? সে কি বলেন? তা' হলে আমার আর কি হ'লো? আমি যে তা'কে—"

"থাম'—থাম'! আর আমার কাজ নয়—থাম'! ইনিস্‌পেক্টারকে বল-গে যাও।" এই বলিয়া, রাইটার-বাবু হৃদয়চন্দ্রকে একটা তাড়া দিলেন।

হৃদয়চন্দ্র নম্রভাবে জিজ্ঞাসিলেন—"তিনি কোথায়? কেমন ক'রে তাঁর দেখা পাবো? আপনি, তাঁর সঙ্গে যদি—"

"ভাল্ আপদ দেখছি! ঐখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক; দেখা হ'বে এখনই।"

বড়ই রুক্ষস্বরে ঐ কথা-কয়েকটী কহিয়া, রাইটার-কনেষ্টবোল মহাশয়, খাটিয়ায় গিয়া আড়া-মোড়া ভাঙ্গিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়-হয়। কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না। ইনিস্‌পেক্টরের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত পাইলেন না; এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও কথার সঠিক উত্তরটাও দিল না! বেশীর ভাগ, এক আধবার এক আধজন কনেষ্টবোল আবার, আধা-হিন্দি আধাবাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল,—"রোপেয়া-ওপেয়া কুছ হায় বলতে পারিস্!" তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে যদি টাকাকড়ি কিছু থাকে, তাঁহারা একবার ইনিস্‌পেক্টারকে জাগিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখেন। হৃদয়চন্দ্রের নিকট পয়সা-কড়ি কিছুই নাই—তিনি নিদারুণ বিপদগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন—এই শুনিয়া, দাঁতমুখ বিকট-শিকট করিয়া, তাঁহারা সকলেই আপনাপন কাজে চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ আবার, ঠাট্টা বিদ্রূপচ্ছলে—অবশ্য নিতান্ত সত্য কথাতেই—মনের আসল ভাবটা প্রকাশ করিয়া, কহিলেন,—"শালার পয়সা কড়ি নেই—শালা মাগ খালাস্ করতে পুলিশে এসেছে! যা শালা—মাগ বিক্রী করগে আগে, তার পর সেই টাকা নিয়ে থানা-পুলিশ করতে আসিস্! থানাপুলিশ কি আর অমনি হয়? পুলিশ, বেটার মাইনে-খেকো চাকর আর কি?"

মধ্যে মধ্যে এইরূপভাবের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, আর হৃদয়চন্দ্র হা-হুতাশ করিতেছিলেন। ক্রমশঃ রাত্রি প্রভাত হইল। কথাটা যেখানে যা রাষ্ট্র হইবার, রাষ্ট্র হইল; যাহাদের যা যোগাড়-যন্ত্র, সব ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু, যিনি সমস্ত রাত্রি থানার দরজায় বসিয়া আছেন—থানার টিকটিকিটি হইতে আরম্ভ করিয়া হাতীটাকে পর্য্যন্ত বিনয় করিয়া আপনার দুঃখকাহিনী বলিতেছেন,—তাঁহার কোনই ফল ফলিল না। মধ্যে একবার চকিতের ন্যায় থানার ইনসপেক্টার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; কথাগুলা তিনিও সব শুনিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু উত্তর দিয়াছিলেন,—"যাও—যাও, ও সব কথা জমাদারকে জানাও-গে যাও।" কিন্তু, জমাদারকে সে কথা জানাইতে গেলে, তিনি ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া টাকার কথাই বারম্বার জিজ্ঞাসা করেন, এবং পুনরায় ইনিস্‌পেক্টারের সহিত দেখা করিতে বলেন। সেই দেখা করবার আশাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

ক্রমে বেলা আটটা। এর মধ্যে, হৃদয়চন্দ্র কোনও সূত্রই পাইলেন না। তাঁহার অভিযোগে কেহ কর্ণপাতও করিল না। পরন্তু, এ আবার কি? তাঁহাকে আর ফিরিয়া যাইতেই দেয় না যে! ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা পাইলে, প্রথমতঃ কনেষ্টবোলেরা বলিয়াছিল—"এখনই সব ঠিক হ'বে; ফিরে যেতে হ'বে না।" এখন আবার অন্যভাবের কথাবার্ত্তা সুরু হইল। হঠাৎ দারোগা বাবু হুকুম দিলেন,—"বাঁধ শালাকে—লাগাও হাতকড়ি। বেটা জালিয়াৎ—বেটা জুয়াচোর—বেটা বদ্‌মায়েস্‌!"

সঙ্গে সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবোল হৃদয়চন্দ্রের হাতে হাতকড়ি দিবার যোগাড়-যন্ত্র করিতে লাগিল।

চক্ষুস্থির! হৃদয়চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওকি বলেন আপনারা? রাত্তির দু'পুর থেকে ঘুরছি আমি—আমার এমন বিপদ, এ সময় কি বিদ্রূপ ভাল লাগে? আমায় কি পাগল—"

"চোপরাও শালা!—জোচ্চোর, জালিয়াৎ, বদ্‌মাস্‌!"

সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন জন কনেষ্টবোল হাতকড়ি লইয়া হৃদয়কে বাঁধিতে গেল।

হৃদয়চন্দ্র বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"এ কি? এ কি করেন আপনারা? আমার যে বড় বিপদ! আমার স্ত্রী যে বেশ্যালয়ে বিক্রীত—আমি যে তাকে বাঁচাবার জন্যে এসেছি! আমার ধর্ম্ম যায়—মান যায়—প্রাণ যায়! আপনারা এসময় এমন করবেন না—আমায় বাঁচান, আমায় রক্ষা করুন—"

দারোগা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"চোপরাও শালা—কের বদমায়েসী? রাম সিং!—শালাকো আবি ঠাণ্ডা-গারদমে লে যাও!"

হৃদয়চন্দ্র কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"আপনারা মা-বাপ; আপনারা মারলেও মারতে পারেন, রাখলেও রাখতে পারেন! আমায় যা' বলতে হয়, যা করতে হয়, পরে বলবেন, পরে করবেন। কিন্তু এখন আমায় বাঁচান—আমার প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়—আমায় বাঁচান।"

যতই অনুনয়-বিনয় করিয়া বলেন, "আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান"; দারোগা বাবুর ততই ঐ কড়া হুকুম! সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে হুকুম তামিল হইতে লাগিল।

হৃদয়চন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"ওগো! আমায় কি দোষে তোমরা এমন করছ? আমি তো এর কিছুই জানিনে? আমায় ছেড়ে দেও—আমি যাই—আমার ধর্ম্ম গেল, সব গেল—আমায় ছেড়ে দেও—আমায় আর আটকে রেখো না! ওগো!—আমার স্ত্রী যে এখনও বেশ্যালয়ে! তোমরা যে তারে বাঁচাবে ব'লে এসেছিলেম! তোমরা ও কি কর? তোমাদের পায়ে পড়ি—তোমরা আর দেরী ক'রো না। এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ হ'লো, তোমরা একবার চল—আগে তাকে বাঁচাবে চল। জাত যায়—ধর্ম্ম যায়—তাকে বাঁচাবে চল।"

কিন্তু সে কথা শোনে কে? হাতে হাতকড়ি পরাইতে পরাইতে, তিন-চারি জনে ধরিয়া, হৃদয়চন্দ্রকে একটা ঘরের মধ্যে পুরিয়া চাবি-বন্ধ করিতে গেল।

তিনি চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কি অপরাধে, কেন তাঁহাকে এরূপ ভাবে আবদ্ধ করা হইতেছে, সে কথা কেহ আর বলিল না; তাঁহার কোন কথাও কেহ আর শুনিল না। তিনি কেবল হায় হায় করিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি কি নরাধম? আমি জীবিত থাক্‌তে আমার স্ত্রীর এই দশা আমায় দেখ্‌তে হ'লো? আমি বেঁচে থেকেও তার ধর্ম্ম-রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না? এর চেয়ে, কেন আমার মরণ হ'লো না। মরণই যে আমার এর চেয়ে শত গুণে শ্রেয়ঃ ছিল!"

এতাদৃশ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে করিতে, হতভাগ্য হৃদয় আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর কিছুকাল তাঁহার আর কোনই খোঁজখবর পাওয়া গেল না। এদিকে সেই বেশ্যালয়ে শ্যামারই যে আর কি দশা ঘটিল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। ঘটনা-চক্রে এমন ঘটনাই ঘটাইয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এইবার একবার পুরাতন কথা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ করিতে হইবে,—রামশরণ বাবুর জননী,—আসন্ন মৃত্যুশয্যাশায়িনী, তিনি একবার জন্মের-মত পুত্রকে দেখিবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছেন। স্মরণ করিতে হইবে,—রামশরণ বাবু, চাকরীর মায়ায়, বেতন-বৃদ্ধির ভাবী আশায়, কার্য্যস্থল কলিকাতা-সহর পরিত্যাগ করিয়া, আসাম-প্রদেশে-দূরৎ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। স্মরণ করিতে হইবে,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী নীরজা, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায়, মৃত্যুর কঠোর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াও, কিরূপভাবে নর-রাক্ষসীর গ্রাসে পতিত হইয়াছে। আর স্মরণ করিতে হইবে,—শ্যামা ও হৃদয় কাহার চক্রান্তে কোথায় পড়িয়া রহিলেন। সংসারের পাঁচটি প্রাণী,—পাঁচ দিকে বিক্ষিপ্ত,—কেহই কাহারও সংবাদ অবগত নহেন। যদি এক একটীকে দেখিতে

চাহেন। এক একদিকে চাহিয়া দেখুন। কিন্তু পাঁচটিকে যে কখনও একত্র দেখিবেন,—জানি-না সে ভরসা আর আছে কিনা?

তবে যদি একে একে দেখিতে চাহেন, ঐ দেখুন, রামশরণ বাবু—আজ কয় দিন হইতে গোয়ালন্দে অপেক্ষা করিতেছেন। কুলির চালান এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই;—ডুরং হইতে সাহেবের প্রেরিত কর্ম্মচারীও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। সুতরাং সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া, প্রতি-উত্তরে কুলিদের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য তিনি আদেশ পাইয়াছেন।

১৭ই ভাদ্র, বুধবার, ভোরের ট্রেণে কুলিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজের মহা ভিড় পড়িয়া গেল। ষ্টীমার প্রস্তুত। ১০টার সময় ষ্টীমার ছাড়িয়া যাইবে। কুলিদিগকে সেদিন আর গোয়ালন্দে রাখা না হয়,—ইহাই তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ! রামশরণ বাবু তাড়াতাড়ি কুলিদিগকে জাহাজে উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একটী একটী কুলি তাঁহার নিকট আনীত হইতে লাগিল; কোন-কোনটীকে বা দূর হইতে দেখিয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার, তিনি লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মেলের চিঠিপত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক-পিওন আসিয়া, তাঁহার নিজ-নামের ও আফিস-সংক্রান্ত খান-কয়েক চিঠি তাঁহার হাতে দিয়া গেল।

নিজ-নামের একখানি চিঠি খুলিয়াই রামশরণ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন,—হৃদয় তাঁহাকে ঐ চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন। কিন্তু, কে সে হৃদয়? ভগ্নীপতি?—সে তো অনেক দিন হ'লো, পদ্মায় ডুবে মারা গিয়েছে! রামশরণ বাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু হস্তাক্ষর দেখিয়া, হৃদয়ের হস্তাক্ষর বলিয়াই তো মনে হইতে লাগিল। রামশরণ বাবু মহা-সংশয়-চিত্তে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন।

পত্রের মর্ম্ম এই,—

"আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবেন। আপনার ভগ্নী শ্যামা বেশ্যার

নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। কল্য সন্ধ্যার সময় আমি তাহা জানিতে পারিয়া, পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু বেশ্যারা বড়ই চক্রান্ত করিয়াছে; তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া, আমিও বিপদে পড়িয়াছি। আপনি শীঘ্র আসিবেন। নহিলে, আর উপায় দেখি না। অনেক যোগাড় যন্ত্রে এই পত্রখানি লিখিলাম।"

"একি!—হৃদয়? হৃদয় জীবিত? এ কে!—শ্যামা? শ্যামা বেশ্যালয়ে বিক্রীত? এ কি এ?"

রামশরণ বাবু যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। হাতের কলম হাতেই রহিল। কলম আর যেন কোনক্রমেই সরিতে চাহিল না।

অতঃপর নিজ-নামের দ্বিতীয় পত্রখানি হাতে উঠিল। দুই-দশটী ডাকঘরের চরণচিহ্নলাঞ্ছিত সেই চিঠিখানির প্রতি প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এইবার তিনি দেখিলেন—চিঠিখানি বাড়ীর চিঠি—কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং সেখান হইতে গোয়ালন্দে প্রতিপ্রেরিত হইয়াছে। রামশরণ বাবু চিঠিখানি খুলিলেন।

কিন্তু, কি দুর্দৈব? পত্রে লিখিত,—

"শ্রীচরণেষু, দাদা মহাশয়, আপনার মাতা-ঠাকুরাণী সাংঘাতিক পীড়িত। আপনি পত্রপাঠ বাড়ী আসিবেন। বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব করিলে, সাক্ষাৎ হইবে না। বাড়ীতে আর কেহ না-থাকায়, তাঁহার বড়ই কষ্ট; কেবল আপনাকে একবার দেখিবার অপেক্ষাতেই তিনি যেন বাঁচিয়া আছেন। সর্ব্বদা আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এ ক্ষোভ যেন না থাকে। পত্রপাঠ আসিবেন,— অধিক আর কি লিখিব?

নিবেদক শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী।"

চক্ষুস্থির! এ পত্র পড়িয়া একেবারেই চক্ষুস্থির!

"আজ এসব এ কি দেখিতেছি? হৃদয় বাঁচিয়া—শ্যামা বেশ্যালয়ে—মা মৃত্যুশয্যায়—এসব এ কি দেখি?" রামশরণ বাবু ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এদিকে ষ্টীমারের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কুলির সর্দ্দারেরা বলিতে লাগিল,—“বাবু! ষ্টিমারের প্রথম ‘সিটি’ দিল। আর জনকয়েক মাত্র বাকী; আপনি আর দেরি করিবেন না। ষ্টীমার শীঘ্রই ছাড়িবে।”

সহস্র ভাবনা দূরে ফেলিয়া, রামশরণ বাবু আবারও খাতা-পত্র লইয়া বসিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন,—“লোকগুলা ষ্টীমারে বোঝাই দিয়ে যা হয় একটা স্থির কর্‌ছি এখনই।” সুতরাং এক-একটি করিয়া পুনরায় কুলির গণনা আরম্ভ হইল।

আর একটী কুলি চালান হইলেই কাজ শেষ হয়। সেই কুলিটী আনীত হইল।

এটী স্ত্রীলোক! কুলি, কিন্তু কেন অবগুণ্ঠনবতী? স্ব-ইচ্ছায় চাকরী করিতে যাইতেছে, কিন্তু কেন কাঁদিতেছে? রামশরণ বাবুর দৃষ্টি আপনা-আপনি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল।

তিনি চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—তাঁহার মনে হইল, ব্রহ্মাণ্ড যেন শূন্যে ঘুরিতেছে। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বুঝিতেই পারিলেন যে, তিনি জাগ্রত—কি নিদ্রিত!

কিন্তু স্বপ্ন-ভ্রম কতক্ষণ থাকে? রমণী চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—

“তুমি—তুমি! ওগো—তুমি আমায় বাঁচাও!”

রমণীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

রামশরণ বাবুও অনেক ক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি যে কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; হতজ্ঞানের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয়বার জাহাজের বাঁশী বাজিল! সর্দ্দারেরা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

রামশরণ বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—“এখন কি করি? কোন্ পথে যাই? ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে যাইব, না মাকে দেখিতে যাইব, না স্ত্রীকে বাঁচাইব?

আর আছে—সাহেবের কাজ। এখন কি করি? কলিকাতার যে পত্র, তাহাতে কলিকাতায় না যাইলেই নয়। হলধরচন্দ্রের যে পত্র, তাহাতে বাড়ার দিকে এখনই রওনা না হ'লে, মার সঙ্গে আর জন্মের মত দেখা হবে না; স্ত্রীকে বাঁচাইতে গেলে, সুরং গিয়া বড়-সাহেবের মত লওয়া চাই। আবার চাকরী বজায় রাখিতে হইলে, কুলির দল চালান দিয়া গোয়ালন্দে অপেক্ষা করিতে হয়। তবে এখন কোথায় যাই।—কি করি?"

জাহাজের শেষ বাঁশী বজিল—ভোঁ-ও-ও-ও-ও।

রামশরণ বাবুর প্রাণের ভিতরও যেন বাজিয়া উঠিল,—ভোঁ-ও-ও-ও-ও।

তিনি বুঝিলেন,—সঙ্কট-সমস্যা যেন তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি দেখিলেন—চারিদিকেই সঙ্কট—চারিদিকেই সমস্যা।

অলঙ্কার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যদুপতির অনেক দিনের সাধ—স্ত্রীর গহনাগুলি গড়াইয়া দিবেন। দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি, সময়ে সময়ে, সেই চিন্তা প্রায়ই তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হয়।

যদুপতির পিতা শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যজন-যাজন প্রভৃতির দ্বারা তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু পুত্র যদুপতিকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য তাঁহার বড়ই সাধ হয়। তাই ব্রাহ্মণ, যদুপতিকে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি কায়ক্লেশে মাসে মাসে ব্রাহ্মণ চারিটি করিয়া টাকা পুত্রের পড়িবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। যদুপতি বাল্যাবধি কষ্টসহিষ্ণু ও সুবোধ-প্রকৃতি। পিতার অবস্থা সকলই তো তিনি বুঝিতেন! সুতরাং যদুপতি, সেই চারিটি মাত্র টাকা উপলক্ষ লইয়া কলিকাতায় আসিয়া, একটী বাড়ীর দুইটী বালককে "প্রাইভেট" পড়াইবার যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। যে বাড়ীতে তিনি "প্রাইভেট" পড়াইতেন, সেই বাড়ীতেই তাঁহার আহারাদির ও অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। তবে সে গৃহস্বামী কায়স্থ; বিশেষতঃ তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-পাচকের ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং যদুপতিকে আপনার জন্য স্বপাকে রন্ধন করিয়া লইতে হইত। দুইটি বালকের পড়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট নিত্য-নূতন পাঠ অভ্যাস করিয়া যাওয়া, অধিকন্তু আপনার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া লওয়া,—কতদূর আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ

অবস্থায়, প্রথমোক্ত দ্বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, যদুপতি প্রায়ই শেষোক্ত কার্য্যে—রন্ধন-ব্যাপারে, অক্ষম হইতেন। প্রায়ই তাঁহার অদৃষ্টে দু'বেলা অন্নাহার জুটিত না; কখনও বা একবেলা রাঁধিয়া দু'বেলা খাইতেন; কখনও বা 'জলটল' খাইয়াই দিন-যাপন করিতেন।

এইরূপ কষ্টে দিনপাত হয়। এমন সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণ প্রায় ছয় মাস কাল শয্যাশায়ী ছিলেন। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে টাকা-কড়ি বা আর কতই থাকিতে পারে? বিশেষতঃ যদুপতির পিতা তো কখনও ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার পীড়ায় চিকিৎসায়, সাংসারিক নানা ব্যয়-বাহুল্যে, অধিকন্তু তাঁহার সৎকার-শ্রাদ্ধাদিতে, সংসার নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যদুপতির জননী কাত্যায়নী দেবীর হাতে টাকাকড়ি সামান্য যাহা-কিছু ছিল এবং তাঁহার গায়ের গহনা-পত্র সমস্তই এই উপলক্ষে ব্যয় হইয়া যায়। পিতার পরলোক-গমনের সময় যদুপতির বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ মাত্র। সেবার তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যদুপতি যে চারিটি টাকা মাত্র বাড়ী হইতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও পুস্তকাদি ক্রয়ের ব্যয়ই কুলান হইত না। বিদ্যালয়ে তিনি অর্দ্ধেক বেতনে পড়িতে পাইতেন; সেই চারি টাকার মধ্য হইতে সে বেতনও তাঁহাকে দিতে হইত। এই অবস্থায়, পিতার ব্যায়রামের সময়, তিন মাস কাল, যদুপতি সেই চারি টাকা সাহায্যেও বঞ্চিত হন; বন্ধুবান্ধবের নিকট ঋণ করিয়া কোনরূপে সে খরচ চালাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কে ভাবে আর কয় দিন চলিবে? পরীক্ষার আরও তিন মাস সময় অবশিষ্ট আছে। সে তিন মাসই বা কেমন করিয়া কাটিবে? বিশেষতঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে একসঙ্গে আবার অনেকগুলি নগদ টাকার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার "ফিজের" টাকা আছে; অগ্রিম তিন মাসের বেতন দেওয়া আছে;—সে সকল টাকাই বা কি করিয়া সঙ্কুলান হইবে? যদুপতি আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলেন। পিতার মৃত্যুর সময় বাড়ী আসিয়া তাঁহার আদ্যকৃত্যের পর সাংসারিক অবস্থা দর্শন করিয়া, যদুপতির ভাবনা

আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। তবে কি যদুপতির লেখাপড়া বন্ধ হইবে? এতদূর অগ্রসর হইয়াও তবে কি পরীক্ষা পর্য্যন্তও সামর্থ্যে কুলাইবে না? যদুপতি জননীর নিকট প্রায়ই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যদুপতির পিতা, চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় যদুপতির বিবাহ দিয়াছিলেন। চারি কন্যার পর তাঁহাদের এক পুত্র যদুপতি। তাহার পরও তাঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিবেন,—অনেক দিন হইতে শঙ্করনাথ ও কাত্যায়নীর মনে সে বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত ঘর-মেল না মিলায়, সর্ব্বসুলক্ষণা সুন্দরী পাত্রী না পাওয়ায়, অনেক দিন পর্য্যন্ত, তাঁহাদের মনের বাসনা মনেই আবদ্ধ ছিল। অবশেষে, অনেক সন্ধান-সুলভের পর, চন্দন-গ্রামের ৺ বিশ্বরাম তর্কবাগীশের পৌত্রী কমলার সহিত যদুপতির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করনাথ, যদুপতির বিবাহ দিয়া কমলাকে গৃহে আনয়ন করেন। বিবাহের সময় কমলার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। বিবাহের পর কমলা দুই তিন বার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। শঙ্করনাথের পীড়ার সময় কমলাকে যে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত কমলা শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করিতেছে। যদুপতি পিতৃকার্য্য উপলক্ষে বাড়ী আসিয়া অবধি এবার বরাবরই কমলাকে দেখিতে পাইতেছেন।

যদুপতির পড়াশুনা-সম্বন্ধে তাঁহার জননীর সহিত যে কথাবার্ত্তা হইত, কমলা প্রায়ই তাহা শুনিতে পাইত। সেই সকল কথা শুনিত, আর কমলা মনে মনে কত-কি কল্পনা করিত। কল্পনার বশে কখনও কখনও তাহার মনে হইত,—"আমার গায়ের দুই একখানা গহনা বিক্রয় করিলে তাঁহার পড়ার ব্যয় কুলান হইতে পারে না কি?" কিন্তু অনেক সময় কমলার সে মনের কল্পনা মনেই বিলীন হইত। কমলা মুখ ফুটিয়া তো কিছু কহিতে পারিত না! সংসারে প্রতিদিনই সেই কথার আলোচনা হয়। প্রতিদিনই হতাশের বিষাদের নূতন নূতন লাঞ্ছনা-সম্পাতে যদুপতির মুখ-শ্রী মলিন-ভাব ধারণ

করে। প্রতিদিনই কমলা সেই কথা শুনিতে পায়, প্রতিদিনই কমলা সেই দৃশ্য দেখিয়া থাকে; প্রতিদিনই কমলা সেই ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়ে। কমলার কমল-হৃদয়ে তখন আর আন্দোলনের অবধি থাকে না। স্থির শান্ত সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার গর্ভে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া, জল-কর্দ্দম-ধাতুনিঃস্রব প্রভৃতি নির্গত হয়। কমলার প্রাণের ভিতর যে চিন্তানল জ্বলিয়া উঠিল, যে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহাই বা সহজে নিবৃত্তি হইবে কি প্রকারে? কমলা চাপিয়া-চাপিয়াও আর চাপিতে পারিল না। শেষ একদিন, মধ্যমা ননদিনীকে প্রাণের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিল। মাকে (শাশুড়ীকে) অনুরোধ করিবার জন্ত প্রার্থনা জানাইল। বুঝাইল,—"দেখ দিদি! গহনা কত হইতে পারে; কিন্তু পড়ার সময় এই দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেলে, সে সময় কি আর কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে?" এই বুঝাইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, কমলা ননদিনীর দ্বারা শাশুড়ীর নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিল।

কাত্যায়নী, কন্তার মুখে সেই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া, প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন; পরে নানারূপ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; শেষ, আপনার অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিয়া, আপনা-আপনিই বিলাপ করিয়া কহিলেন,—"হা ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল! সোণার-কমল শিশুর অঙ্গ হ'তে সোণার পাপড়ী গহনাগুলি ছিঁড়ে নিতে হ'ল!" কিন্তু না লইলেও আর উপায় নাই! ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা চিরতরে লোপ পায়! কাত্যায়নী মনে মনে ডাকিলেন,—"মা কাত্যায়নী! অভাগিনীর অপরাধ লইও না। যদুপতি ও কমলার মুখ চাহিয়া, তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিয়াই, আমায় এই পিশাচ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল।" কাত্যায়নী আরও প্রার্থনা জানাইলেন,—"মা গো! কমলার অলঙ্কার-মোচন যেন সার্থক হয়। বিদ্যার্জ্জনের পর ধনোপার্জ্জনে যদুপতি যেন কমলাকে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা করিতে সমর্থ হয়। তবেই মা, আমার এ ক্ষোভ কতক মিটিতে পারিবে।"

শাশুড়ীর এতাদৃশ 'মৌনে সম্মতি লক্ষণ' বুঝিতে পারিয়া, কমলা, আপন হস্তের সোণার বালা দুইগাছি খুলিয়া লইয়া, তাঁহার চরণতলে উপনীত হইল; অতি ধীরে ধীরে বিনয়-নম্র-বচনে কহিল,—"মা! আপনি মনে কোনরূপ সঙ্কোচ কর্‌বেন না। গহনা আবার হবে। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোনও ক্ষোভ থাকবে না।" একান্ত অনিচ্ছায়, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, দারুণ আত্মগ্লানি চাপিয়া রাখিয়া, কাত্যায়নী কমলার হাতের বালা-দুইগাছি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই বালা দুই গাছি, পাড়ার একজন স্ত্রীলোকের নিকট বন্ধক দেওয়া হইল। রায়গৃহিণী বালা বন্ধক দিয়া "সাড়ে সতের গণ্ডা" টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিল। সেই টাকার মধ্য হইতে ৫০৲ পঞ্চাশটী টাকা যদুপতি কলিকাতায় লইয়া গেলেন; অবশিষ্ট কুড়ি টাকা সংসারের খুচরা দেনা-পত্র মিটাইবার জন্য দেওয়া হইল।

ইহাই সূত্রপাত। ইহার পর কমলার গায়ে আরও যে যে গহনা ছিল, সংসারের দৈন্য-দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া, বিশেষতঃ যদুপতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার "এলে"-পড়ার পুস্তকাদি ক্রয়-জন্য, সেগুলিও একে একে কমলা গা হইতে খুলিয়া দিয়াছিল। তার পর গহনা বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাই ঘটিয়াছিল সেই বন্ধকের অল্প টাকাতেই সুদে সুদে গহনাগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

যদুপতি সকল ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঘটনাগুলি পরতে পরতে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে সজ্জিত ছিল। উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি, সেগুলি যেন এক একবার প্রাণটাকে আলোড়ন করিত। সঙ্গে সঙ্গে যদুপতির মনের মধ্যে কতই পুরাতন-স্মৃতি ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার মনে হইত,—কিশোরী কমলা বধূবেশে ঘরে আসিয়া, সংসারের দৈন্যদারিদ্র্যে অভিভূত হইয়া, কেমনভাবে হাসি-হাসি-মুখে একে একে গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া দিয়াছিল! আর মনে হইত,—বালিকা বধূর গহনা বিক্রয়ের অর্থে কেমন করিয়া তাঁহার সংসার চলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাঁহার লেখা-পড়া-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল!

ক্ষুদ্র একটী যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তার পর দ্বাদশ বর্ষের অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আর সেই দীর্ঘকালে—সংসারের কত পরিবর্ত্তনই না সাধিত হইয়াছে! যদুপতি উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছেন। জননী কাত্যায়নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটী ভগিনী বিধবা হইয়া পুত্রকন্যাসহ যদুপতির আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। কিশোরী কমলা, প্রৌঢ়া গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার ক্রোড়ে সোণার কমল দুইটী পুত্রসন্তান শোভা পাইতেছে সংসারের দেনা-পত্র সমস্তই পরিশোধ হইয়াছে। বাড়ী-ঘরের শ্রীছাঁদ ফিরিয়াছে। যদুপতি দেশের-গণ্য দশের-মান্য হইয়া সর্ব্বত্র যশঃসম্মান-লাভ করিতেছেন।

সকলই হইয়াছে; কিন্তু হয় নাই—কমলার অলঙ্কারগুলি! তাহাতে যদুপতিরও তত দোষ নাই। কমলাই ইচ্ছা করিয়া যেন সে পক্ষে উদাসীন আছে। গহনার কথা উঠিলে, কমলা এ পর্য্যন্ত কেবলই বলিয়া আসিয়াছে, —“সে জন্য ভাবনা কেন? আগে দেনা পত্র শোধ যাক, আগে বাড়ী-ঘর প্রস্তুত হউক, আগে অন্যান্য অভাবের মোচন করুন; তারপর আমার গহনা, আমার দিলেই হইবে।”

যদুপতির হৃদয় কি যেন এক নূতন উপাদানে বিগঠিত। বাল্যকালে তিনি বড় কষ্টই পাইয়াছেন। অন্যের সামান্য কষ্ট দেখিলে, তাই তাঁহার প্রাণটা অতি কাতর হইয়া উঠে। পরের কষ্ট-মোচনে তিনি যেন সদাই মুক্তহস্ত। আর তজ্জন্য, তাঁহার হাত প্রায়ই শূন্য হয়। নচেৎ, অন্য প্রকৃতির লোক হইলে, এতদিন কি তিনি স্ত্রীর গহনাগুলি গড়াইয়া দিতে পারিতেন না? যাহা হউক, এবার তাঁহার একান্ত বাসনা,—কমলার অলঙ্কারগুলি কলিকাতা হইতে গড়াইয়া আনিবেন।—৺ মহাপূজায় বাড়ী আসিবার সময় গহনাগুলি সঙ্গে আনিয়া কমলাকে নূতন সাজে সাজাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যদুপতির মাসিক উপার্জ্জন তিন শত টাকার কম নহে। অথচ, এ পর্য্যন্ত তিনি স্ত্রীর গহনা কয়খানি গড়াইয়া দিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, লোকে ইহাতে আশ্চর্য্য হইতে পারে না কি?

তবে কি যদুপতির কোনও অপব্যয় আছে? তবে কি যদুপতির চরিত্রগত কোনও দোষ জন্মিয়াছে? যাহারা তাঁহার আয়-ব্যয়ের গূঢ়তত্ত্ব অবগত নহে, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া দূর হইতে বাহিরে বাহিরেই যাহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, অথবা অপরের ছিদ্রান্বেষণই যাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত আছে,—তাহাদের মনে কত কথাই কত সময় উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে যাঁহারা অগ্রসর হন, যদুপতির আচারে ব্যবহারে চলনে চরিত্রে তাঁহারা কি চিত্র দেখিতে পান?

যদুপতির কলিকাতার বাসাটিকে একটী ক্ষুদ্র অন্নসত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বাস-গ্রামের দশক্রোশ ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম-সমূহের অধিবাসী-দের, যাঁহারই যখন কলিকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়, যদুপতির বাসা তাঁহারই সংবর্দ্ধনার জন্য যেন নিয়ত বাহু প্রসারণ করিয়া আছে। বিশেষতঃ বিদ্যার্থী দরিদ্র বালক, কলিকাতার কোথাও আশ্রয় না পাইলে, যদুপতির বাসায় তাহার আশ্রয় আছেই আছে। যদুপতির বাসার মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করিলে, 'মেছের' বাসা বা ছাত্রাবাস বলিয়া ভ্রম হয়। উপরে নীচে সকল ঘরে সারি-সারি বিছানা পাতা। প্রতি বিছানার মাথার দিকে অল্প-বিস্তর পুস্তকের স্তূপ। কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র এক একটী টীনের বাক্স; কোথাও কোথাও তৎপরিবর্ত্তে মাথার ধারে কাপড়ের পুঁটুলি। প্রতি শয্যাপার্শ্বে এক-একটী মাটীর প্রসূজের উপর তেলের প্রদীপ। বাসার কি অপরূপ শোভা হয় সন্ধ্যার সময়,—যখন বালকের দল, আপন-আপন প্রদীপটী জ্বালিয়া, আপন আপন

শয্যার উপর বসিয়া, আপন-আপন পুস্তক খুলিয়া, তন্ময় হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদুপতির উপার্জ্জনের অনেক অংশই এই বাসার ব্যয়-নির্ব্বাহে, দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতিপালনে, ব্যয়িত হইয়া থাকে। যদুপতির ঠাকুরদাদা-সম্পর্কীয় অনেক হিতৈষী আত্মীয়, তাঁহার এই ব্যয়-বাহুল্য দর্শন করিয়া, মিষ্ট-উপদেশ-চ্ছলে একবার তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,—"এমন করিয়া অপব্যয় করিলে, কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়। কিন্তু তোমার তো এই সামান্য কয়টি টাকা আয়। মনে কর দেখি,—তুমি যদি কখনও ব্যায়রাম হইয়া পড়িয়া থাক, তোমার স্ত্রী-পুত্রের দশা কি হইবে? সেরূপ অবস্থায়, তোমারই বা চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা কে করিবে?" কিন্তু যদুপতি তাহাতে মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া বিনীত-স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন,—"ঠাকুর-দাদা মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি মনে করি, সকলই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ! আমার মনে হয়, আমার যে দুই পয়সা আয়-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও ঐ দরিদ্র ছাত্রদিগের অদৃষ্টগুণে। মনে করুন, যদি আমার উপার্জ্জনের পথ চির-রুদ্ধ থাকিত,—তাহা হইলেই বা আমার ও আমার পুত্র-পরিবারের কি দশা ঘটিত! ভগবান যে আমায় তেমন দৈন্য-দশায় রাখেন নাই, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। আর সে অনুগ্রহের মূল কারণ, আমার মনে হয়, ঐ দরিদ্র ছাত্রদিগের আশীর্ব্বাদ।" যদুপতির এই উত্তরে তাঁহার হিতৈষী আত্মীয় কিন্তু বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিলেন,—"চিরদিন এ চাল বজায় রাখিতে পার, ভালই। তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন তো আমি কখনও অমঙ্গলের কামনা করি না। তোমার বাল্যকালে তোমার মা ও তুমি বড় কষ্ট পেয়েছিলে, বার্দ্ধক্যে আর সে কষ্ট তোমাকে না পেতে হয়, তাই কিছু সঞ্চয়ের জন্য এ সব বলে থাকি। শোন, ভালই; না শোন, নিজেরই আপশোষ হবে।" যদুপতি আত্মীয়ের মনস্তুষ্টির জন্য তদনুরূপ উত্তর দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; মনে ভাবিয়া ছিলেন,—"বলি না কেন—'আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি চেষ্টা করিয়া

দেখিব।" কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে উত্তর কোনক্রমেই বাহির করিতে পারেন নাই। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে, যাতনার কি যেন এক তীব্র তাপ, তাঁহার প্রাণের ভিতর উদ্ভূত হইয়া, সে চিন্তাস্রোত শোষণ করিয়া লইয়াছিল। যদুপতির মনে তখন নূতন চিন্তার উদয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন,—"আমি বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। পাঠদশায়, পুস্তকের অভাবে, বেতনের অভাবে, অন্নের অভাবে, দরিদ্র বালকেরা যে যন্ত্রণা ভোগ করে, আমি হাড়ে হাড়ে সে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমি যদি সে যন্ত্রণার গুরুত্ব ও ভীষণতা উপলব্ধি করিতে না পারিব, তবে কে তাহা উপলব্ধি করিবে! যাহারা চিরসুখক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত, সে যন্ত্রণা তাহারা কি বুঝিবে!" যদুপতির প্রাণের ভিতর তখন যেন পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল,—'দরিদ্র বালকের পঠদশার কষ্ট আমি হাড়ে-হাড়ে ভোগ করিয়াছি; সে কষ্ট আমি যতদূর উপলব্ধি করিব, চিরসুখমগ্ন ধনিসন্তানেরা তাহা কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন?" এই সূত্রে কবি-কৃষ্ণচন্দ্রের সেই কবিতা-পংক্তিচয় যদুপতির মানসপটে স্বতঃই প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি আপনা-আপনিই বলিতে লাগিলেন,—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥"

যদুপতির আরও মনে হইতে লাগিল,—'পঠদশায়, দারুণ কষ্টভোগ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া, কতসময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,—'ভগবান যদি কখনও আমায় দিন দেন, আমি দরিদ্র বালকের পঠদশার কষ্ট দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইব।' ভগবান এখন আমার সে প্রার্থনা শুনিয়াছেন; অনুকম্পা-প্রদর্শনে আমার সে দৈন্য-দশার পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়া দিয়াছেন। এখন আমি আমার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে

পারি কি? আমি বড় কষ্ট পাইয়া বড় কাতরতায় ভগবানকে ডাকিয়াছিলাম। এখন যদি আমি প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হই, নরকেও যে আমার স্থান হইবে না!” আত্মীয়, আশানুরূপ উত্তর না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিলেও, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যদুপতির প্রাণের ভিতর এই চিন্তা-প্রবাহ প্রবহমান ছিল।

যদুপতির বাসায় এতগুলি ছাত্র এরূপভাবে প্রতিপালিত হয়, অথচ তদ্বিষয়ে তাঁহার আত্ম-প্রশংসার ঢক্কা-নিনাদে কাহারও কর্ণপটহ কদাচ প্রতিধ্বনিত হয় না। সংবাদপত্রেও কখনও সে কথার কোনও আলোচনা দেখা যায় না; লোকমুখেও সে সংবাদ তৎদূর প্রচারিত নহে। নীরবে ধীরভাবে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-বোধে যদুপতি নিরন্ন বালকদিগকে অন্নদান করেন; নীরবে ধীরভাবে বায়ু-প্রবাহের মধ্য দিয়া আপনা-আপনিই সে সংবাদ ভগবানের নিকট সংবাহিত হয়; নীরবে ধীরভাবে বালকদিগের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদুপতি মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইয়া থাকে।

বাসার যে ঘরটিতে যদুপতি অবস্থান করেন, সে ঘরটি দ্বিতলের এক পার্শ্বে অবস্থিত। ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র নহে; কিন্তু ঘরের ভিতর একপার্শ্বে একখানি তক্তাপোষে তাঁহার সামান্য একটি বিছানা, আর চারিদিকেই রাশি রাশি পুস্তকের সমাবেশ! পুস্তকে যেন ঘরটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, লাটিন,—কত ভাষারই কত প্রকার গ্রন্থ! সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য. দর্শন, পুরাতত্ত্ব,—সকলেরই যেন সারতত্ত্ব সে প্রকোষ্ঠে সংগৃহীত আছে! নিরন্ন দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতিপালনে যদুপতির যেরূপ যত্ন, বিবিধ ভাষার বিবিধ প্রকারের পুস্তকাদি সংগ্রহেও তাঁহার তদ্রূপ আগ্রহ। এক দিকে যেমন বিদ্যার্থী কোনও দরিদ্র বালক আসিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তাঁহার নিকট প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হয় না; অন্যদিকে আবার, কোনও দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ উপাদেয় গ্রন্থ বিক্রয় করিতে আসিয়া, কোনও “হকার” কখনও তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। যদুপতির জীবনের এ দুটি যেন

কি বিশেষত্ব-লক্ষণ! রাশি রাশি পুস্তক-ক্রয়-সম্বন্ধে একবার তাঁহার কোনও আত্মীয়, তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,—"রাশি রাশি টাকা ব্যয় করিয়া কতকগুলা পুস্তক কিনিয়া কি ফল হইতেছে? পড়িয়া জ্ঞানলাভ তো দূরের কথা, অত পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেও যে জীবনে কুলাইবে না! আর দিন কতক পরে ও-গুলা উই ও ইঁদুরের আশ্রয়-স্থল হইবে বৈ তো নয়!" কিন্তু যদুপতি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"পুস্তক-রাশির মধ্যে বসিয়া থাকিলেও, জ্ঞানলাভ আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। সৎসঙ্গে বসবাস করিলে যেমন সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞানাধার গ্রন্থরাজির মধ্যে অবস্থিতি করিলেও তদ্রূপ জ্ঞান-সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা।"

যদুপতি কীটের ন্যায় গ্রন্থপত্র মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার জীবিকার পক্ষেও তাহা সহায়ক হইয়াছিল. কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে যদুপতি অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেজন্যও তাঁহার বিদ্যা-চর্চ্চার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন জন্যও, গ্রন্থ-পাঠের—বিদ্যালোচনায় যদুপতির প্রয়োজন হইয়াছিল। ফলতঃ যে কারণেই হউক, অধ্যয়নে তাঁহার কদাচ বিরতি ছিল না। স্কুলের চাকরীতে যদুপতি বেতন পাইতেন—দেড় শত টাকা। তাঁহার বিরচিত গ্রন্থাদিতেও তাঁহার আয় ছিল—প্রায় দেড় শত টাকা। কখনও কখনও সে আয় কিছু বাড়িত বটে; কিন্তু ব্যয়—কলিকাতার বাসায়, ব্যয়—পুস্তকাদি ক্রয়ে, ব্যয়—দেশের সুবৃহৎ সংসার-প্রতিপালনে। তার পর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো, তাঁহার উপর আরও কত ব্যয়-ভারই চাপান ছিল! তাঁহাকে ঋণদায় হইতে মুক্তি পাইতে হইয়াছে; তাঁহাকে পৈত্রিক বাস্তুভিটায় বাড়ীঘর করিতে হইয়াছে; জননী কাত্যায়নীর আদ্য-শ্রাদ্ধে এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহেও তাঁহার কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। একা মানুষ—একা উপার্জ্জনক্ষম; অথচ, ব্যয় নানাদিকে! তিনি কত দিক দেখিবেন? সুতরাং চেষ্টার উপর চেষ্টা করিয়াও, আজি দশ বৎসরের মধ্যে, কমলার গহনা কয়খানি তিনি গড়াইয়া দিতে পারেন

নাই। যেবারই ভাবিয়াছেন,—"এইবার গহনাগুলি গড়াইয়া দিব;" সেই বারই একটা-না-একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যেমন লক্ষ্মী, তেমনি জনার্দ্দন। যেমন যদুপতি, তেমনি তাঁহার স্ত্রী কমলা সুন্দরী। নচেৎ, মাসে মাসে যদুপতি বাড়ীতে যে সংসার-খরচের টাকা পাঠাইয়া দেন, তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া, কমলা কি আপনার গহনা-কয়খানা ক্রমশঃ গড়াইয়া লইতে পারিতেন না? সংসারের সকলেই এইরূপে দুই-পয়সা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে! কিন্তু কমলার কি যেন কি বিপরীত প্রকৃতি! সঞ্চয় দূরে থাক, কমলা যেন আবশ্যকানুরূপ ব্যয়-নির্ব্বাহেই কুলান করিতে পারেন না। কেহ কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—"পুত্র, কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়, চাকর, চাকরাণী প্রভৃতিতে যদুপতির সংসারে তো পোষ্য-প্রতিপাল্যের কমি নাই! কমলা কুলাইবেই বা কি করিয়া?" কিন্তু অন্য পক্ষ তাহাতে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন,—"পল্লীগ্রামের সংসারে, একটী পরিবারের মোট-ভাত মোটা-কাপড়ে আর কত ব্যয় পড়ে? বিশেষতঃ দুই দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও জোত-জমাও তো আছে! আরও, যদুপতি, সত্তর, পঁচাত্তর, কোনও কোনও মাসে আবশ্যক বুঝিয়া একশত টাকা পর্য্যন্ত সংসার-খরচের জন্য পাঠাইয়া থাকেন। তবে কমলা কিছু বাঁচাইতে না পারিবেন কেন?"

নানা লোকের নানারূপ সিদ্ধান্তে চিত্ত বিভ্রান্ত করিবার আবশ্যক কি? কমলার সংসারে কিসে কি ব্যয় হয়, একবার সন্ধান লইলেই তো সকল গোল চুকিয়া যায়! আজ চৈত্র-সংক্রান্তি; ঐ দেখুন যদুপতির বাড়ীতে—নন্দনপুরে—কলসী-উৎসর্গের কি ধূম পড়িয়া গিয়াছে! আরও দেখুন, বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনেরই বা কি বিরাট আয়োজন চলিয়াছে।

কাল সূর্য্যোদয়ে পুণ্যাহ বৈশাখ মাসের আবির্ভাব হইবে; ঐ দেখুন, কমলা জলদানের ফলদানের ব্রত গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন;—সারা মাস সেই ব্রতের অনুষ্ঠান-পরম্পরা চলিতে থাকিবে। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, কমলার অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত আছে। এইরূপ জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রী ব্রত, আষাঢ়ে মনোরথ দ্বিতীয়া, শ্রাবণে শীতলা সপ্তমী, ভাদ্রে অনন্তচতুর্দ্দশী, আশ্বিনে বীরাষ্টমী,—কমলার বার-ব্রতের অবধি আছে কি? কমলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের দুহিতা, কমলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে পরিণীতা;—কমলা যদি এ সকল বারব্রতের অনুষ্ঠান না করিবে, তবে আর কে তাহা করিবে? কমলা তাই মনে করে,—পূর্ব্বজন্মের পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে সে যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! সে যদি এ সকল ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতিপালন না করিবে, তবে কাহার জন্য সে সকল বিহিত হইয়াছে? কমলা প্রায় সকল ব্রতই গ্রহণ করিয়াছে; তাহার কোনও ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে;—কোনও ব্রত বা উদ্‌যাপনের জন্য সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সত্য বটে, কমলা উপবাস করিতে কাতর নহে; সত্য বটে, কমলা কষ্ট সহিতে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু কমলা যে বার-ব্রতে দান-ধর্ম্মে মুক্তহস্ত, তাহা সম্পন্ন করিয়া অর্থ-সঞ্চয়ে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইবে কোথা হইতে?

অর্থসঞ্চয়ে কমলার আর এক অন্তরায়,—কমলার আত্মপর ভেদ-জ্ঞান বড়ই অল্প। কেবল আপনার সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াই কমলা তো নিশ্চিন্ত হইতে পারে না! সে যখন শুনিতে পায়,—ছিদাম বাগদী তাহার ‘অথর্ব্ব’ বুড়ী-মাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আর বুড়ীটা রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতেছে; তখনই ছিদামের-মা'র গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ছিদামকে ডাকিয়া বুঝাইয়াই হউক, অথবা দু'পয়সা সাহায্য দিয়াই হউক,—কমলা বুড়ীর ব্যবস্থা না করিয়া কোনক্রমেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। এক বার, সামান্য তিন টাকা তের আনা খাজনার জন্য, পত্তনিদারের তিন জন পাইক আসিয়া, প্রতিবাসী মথুরদাসকে পিঠমোড়া

করিয়া বাঁধিয়াছিল, জুতা লাথি মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার নাকে-মুখে থুতু দিতে এবং তাহার স্ত্রীকে বে-ইজ্জত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। সেবার, মধুদাসের স্ত্রী থাকমণি, আতঙ্কে বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া, কমলার পা-দুখানি জড়াইয়া ধরে; কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা জানায়,—"মাগো! আমার ধর্ম্মরক্ষা কর! আমার স্বামীরে বাঁচাও!" আরও মর্ম্মভেদী স্বরে বলে,—"যমদূতেরা এতক্ষণ বোধ হয় তাঁকে খুন করে ফেল্‌লে! আপনি না বাঁচালে, আমাদের বাঁচাবার আর কে আছে,—বলুন!" কমলা, সেবার লোক পাঠাইয়া, পত্তনিদারের প্রাপ্য গণ্ডা চুকাইয়া দিয়া, মধুদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু সেই সমস্ত ব্যাপার যদুপতিকে জানাইয়া প্রতিকার-উপায় নির্দ্ধারণে জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তদবধি, যদুপতির বাসগ্রাম নন্দনপুর, যদুপতি নিজেই পত্তনি গ্রহণ করিয়াছেন; কমলার প্রতি গ্রামের দীন-দুঃখী প্রজাগণের আশীর্ব্বাদের আর অবধি নাই।

কমলার আর এক গুণ,—কমলা পরসেবায় কখনও কাতর নহে। প্রতিবাসী কেহ অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট, কেহ রোগশয্যায় শায়িত, তাহাদের কষ্ট-নিবারণে—সন্তাপ-দূরীকরণে, কমলা নিয়ত যত্নশীলা। ঐ যে পশ্চিমপাড়ার কুঁড়ে ঘরখানির মধ্যে দুটি অপগোণ্ড শিশু-সন্তান-সহ রামহরি চক্রবর্ত্তীর বিধবা পত্নী কুমুদিনী দেবীকে দেখিতেছেন;—বলিতে পারেন কি, তাঁহার চলে কি করিয়া? রামহরির অবস্থা তো কাহারও অবিদিত নাই! মৃত্যুকালে তাঁহার সৎকারের টাকা কয়টির জন্যই কি কষ্ট না পাইতে হইয়াছিল! তার পর, তাঁহার লোকান্তরে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হইয়াছে, কেহ সন্ধান লন কি? সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা,—প্রকাশ্য ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনেই বা কি প্রকারে সমর্থ হইবেন? বিশেষতঃ যে বয়সে তিনি বিধবা হইয়াছেন, সে বয়সে ঘরের বাহির হইলে দশে-ধর্ম্মেই বা কি কহিবে? তবে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের উপায়? একি! সমাজ!—নিরুত্তর কেন? অপরের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শ্রবণে, তুমি উৎকর্ণ

হইয়া আছ; কিন্তু এই সময়ই তোমার যত বধিরতা! অথবা, অপরের দোষকীর্ত্তনকালেই তোমার যত কিছু বাক্‌পটুতা; নচেৎ, অন্য সময় তোমার জিহ্বায় জড়তা আশ্রয় করে? কিন্তু যাউক সে কথা। কমলা যদি কুমুদিনীর তত্ত্ব না লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি দশা ঘটিত—মনে কর দেখি! কুমুদিনীর ছেলে-মেয়ে দু'টিকে প্রায়ই বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া, কমলা আপনার পেটের ছেলে মেয়ের মত তাদের আদর-যত্ন করেন; কুমুদিনীর জন্যও প্রত্যহ তিনি সিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কেবল একা কুমুদিনী বলিয়া নহে; গ্রামের আরও দুই একটী অবিরা বিধবা কমলার নিকট যে অল্পবিস্তর সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিন বৎসর পূর্ব্বে নন্দনপুরে কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়। উত্তর-পাড়ার অনেকগুলা লোক, সেবার কলেরায় মারা পড়িয়াছিল। কলেরা রোগীর নাম শুনিলে, সেদিকে কেহই যাইতে চাহিত না। যদুপতির জ্ঞাতি-খুড়া তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেবার কলেরায় মারা পড়েন। তারাকান্তের স্ত্রী এবং শিশু পুত্র দুটীও সেই সময়ে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু কমলা, দিনরাত্রি শুশ্রূষা করিয়া যেরূপে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন, সে কথা গ্রামের লোক বোধ হয় কখনও ভুলিতে পারিবে না। কমলাকে সেবার কেহ কেহ বারণ করিয়াছিল,—"ওলাউঠা সংক্রামক রোগ। ওলাউঠা রোগীর সংস্পর্শে যাইলে, ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" কিন্তু কমলা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"যদি পেটের ছেলে-মেয়ের কখনও কলেরা হয়, পিতামাতা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান কি? অথচ, পুত্র-কন্যার শুশ্রূষায়, পিতামাতা যে পুত্রকন্যার রোগে আক্রান্ত হন, কদাচ তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ কলেরা রোগীর দেহ বা মলমূত্র স্পর্শ করিলেই যদি রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার নিশ্চয়তা থাকিত, তাহা হইলে মেথর বা মুদ্দাফরাসদের বংশ বোধ হয়, পৃথিবী হইতে কোন্ কালে লোপ পাইত।" যাহা হউক, কলেরার বৎসর কমলা কাহারও বারণ শুনেন নাই। ঔষধ, পথ্য এবং পরি-

চর্য্যার ব্যবস্থায় তিনি গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন।

হঠাৎ কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—যদুপতির বাড়ীতে পোষ্যবর্গের মধ্যে হলধর বর্দ্ধনের ছেলে-মেয়ে দুটীকে দেখিতে পাই কেন? উহারা সদ্‌গোপ; কিন্তু ব্রাহ্মণ-পরিবারের পোষ্যমধ্যে পরিগণিত হইল কি প্রকারে? ইহাও কমলার কৃপা বলিতে হয়। হলধর বর্দ্ধনের কু-চরিত্রের কথা অনেকেই বোধ হয় স্মরণ আছেন। সে যে কখন কোথায় কোন্ কু-মতলবে পরিভ্রমণ করে, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ কলেরাব বৎসরে স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে সে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোনই সন্ধান নাই। কেহ বলেন,—স্ত্রীকে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ গ্রাম হইতে পলাইবার সময় পথে ওলাউঠাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেহ বলেন—একটা বদ্‌মায়েসীর মোকদ্দমায় ধরা পড়িয়া বিগত বৎসরের ভাদ্র মাস হইতে সে জেলে পচিতেছে। যাহাই হউক, হলধর মরুক আর বাঁচুক, তাহাতে কাহারও তাদৃশ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে তাহার পুত্রকন্যা-দুটির আশ্রয়-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে যাহা জনশ্রুতি আছে, তাহাই বলিতেছি। হলধরের স্ত্রীর যখন মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার পুত্রকন্যা দুইটীও তখন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। সেই অবস্থায়, হলধর, স্ত্রী-পুত্র তিনটিকে ফেলিয়া, পলায়ন করে। একি! নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন যে? কথাটা, অবিশ্বাস হইল নাকি? বলিবেন কি,—'অস্বাভাবিক!' জিজ্ঞাসা করিবেন কি,—'পতি হইয়া সহধর্ম্মিণীকে, পিতা হইয়া পুত্রকন্যাকে, এরূপভাবে কখনও কেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে কি?' কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন—"Truth is stranger than fiction" অর্থাৎ উপন্যাস বা কল্পনা অপেক্ষাও সত্য অধিকতর আশ্চর্য্য। এ সংসারে মানুষ পারে না কি?—এ সংসারে মানুষ করে না কি? দেবত্ব ও রাক্ষসত্ব—উভয়েরই পূর্ণবিকাশ মানুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ, আপনার মুখের গ্রাস অনায়াসে পরকে প্রদান করিয়া আপনি অনশনে জীবন-যাপন

করিতে পারে। মানুষ-দধিচি আপন অস্থি প্রদান করিয়া দেবলোকের ইষ্ট-সাধন করিয়া থাকে; আবার এই মানুষই, সহধর্ম্মিণীর শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াও, অবহেলায় স্বামীর গলায় ছুরি দিতে পারে; এই মানুষই, স্নেহময়ী জননীর অটুট মমতা লাভ করিয়াও, ক্ষণিক সুখের আশায় মমতার আধার সন্তানকে হত্যা করিয়া, মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। এ সংসারে এতাদৃশ বিসদৃশ ঘটনার অসদ্ভাব আছে কি? সেদিনও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এক ব্রাহ্মণ-স্কুল-মাষ্টারের পত্নী, উপপতির মনস্তুষ্টি-সম্পাদনে, পরন্তু আপনার সুখের অন্তরায় মনে করিয়া, আপনার একমাত্র কিশোর পুত্রকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক দিন পরে, গোয়েন্দা-পুলিশের গূঢ় অনুসন্ধানে, শয়ন-ঘরের মেজে খুঁড়িয়া, বালকের গলিত স্খলিত মৃতদেহ বাহির করা হয়। মাদ্রাজের উচ্চ বিচারালয়, বিচারে ব্রাহ্মণ-পত্নীর যে দণ্ডবিধান করেন, সংবাদপত্র-পাঠক অনেকেই সে সংবাদ অবগত আছেন; তাহার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবেই বুঝুন, এ সংসারে সম্ভব অসম্ভব কিছুই নাই। হলধর বর্দ্ধন যে আপন পীড়িত স্ত্রীপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, কমলা যখন শুনিতে পাইলেন,—হলধর বর্দ্ধন আপন স্ত্রীপুত্রদিকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, তিনি তখন তাহাদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে যত্নবতী হইলেন। সেই সময়ই, তাঁহারই চোখের উপর, হলধরের স্ত্রী প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু, মৃত্যুর পূর্ব্বে ছলছল নেত্রে কমলার প্রতি চাহিয়া, অভাগিনী বলিয়া গেল,—"আমার আর কেউ নেই মা! ঐ ছেলে-মেয়ে দু'টি রইলো; যদি বাঁচাতে পারেন, বাঁচান। ও দুটীর ভার আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম আজ!" এই কথা-কয়েকটি কহিয়া যেদিন হলধর-গৃহিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিল, সেইদিন হইতেই তাহার পুত্র-কন্যা-দুটির লালন-পালনের ভার কমলার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কমলা প্রথমতঃ সুচিকিৎসার সুব্যবস্থায় তাহাদিগের জীবন-রক্ষা করিয়াছেন; তার পর তাহা-

দিগকে আপন আলয়ে আনয়ন করিয়া সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করিতে-ছেন। শিশু-দুইটীর মা মরিয়াছে বটে; কিন্তু কমলার আশ্রয়ে আসিয়া, কমলার স্নেহ-যত্নে, মা-মরার শোক তাহারা বড় একটা অনুভব করিতে পারে নাই। ফলতঃ, পরিচয় না পাইলে, লোক হঠাৎ বুঝিতে পারে না,—ঐ দুইটী সদ্‌গোপের সন্তান, পরের সংসারে কি ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে!

যাঁহার এত দয়া—যাহার এত দিকে দৃষ্টি, কেমন করিয়া তিনি গহনা গড়াইবেন কি প্রকারে? কাজে কাজেই কমলা, দিন দিন আয়-বৃদ্ধি সত্ত্বেও, গহনাগুলি গড়াইয়া লইতে পারেন নাই! তাঁহার গহনাগুলি না গড়ানর, দোষ কাহারও নাই। দোষ—যদুপতিরও দোষ নাই! দোষ—কমলারও নাই! "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।" দোষ কার? ভগবান যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে তো সেই কার্য্যই করিবে? যে গহনা গড়াইবার, সে গহনা গড়াইয়াই জীবন যাপন করুক! যে অন্য কার্য্যে—প্রাণী-হিতব্রতে নিযুক্ত, (তন্ময় হইয়া—আত্ম ভুলিয়া,) সে তো তাহাই করিবে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যতদিকে যত ব্যয়-বৃদ্ধি হউক, যদুপতি কিন্তু এবার স্থির-নিশ্চয় করিয়া-ছেন,—কমলার গহনাগুলি গড়াইয়া দিবেন। বৈশাখ মাসে, 'গুড ফ্রাইডের' ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিন্ধ্য-বাসিনী তাঁহাকে বড়ই অনুযোগ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"তুমি এত দিন এত রোজগার করিলে; কিন্তু বৌয়ের গহনা কয়খানা গড়াইয়া দিতে পারিলে না? কি অবস্থায় কমলার গায়ের গহনাগুলি খুলিয়া লইয়াছিলে, একবার মনে করিয়া দেখ দেখি!" বিন্ধ্যবাসিনীর এই কথাগুলি, যদুপতির হৃদয়ে যেন শেল-

সম বিদ্ধ হইয়াছিল। বাড়ী হইতে প্রত্যাগমনাবধি যদুপতি প্রায়ই ভাবিতে-ছিলেন,—"কি করিয়া কমলার গহনাগুলি গড়াইয়া দিতে পারি!"

তীব্র উদ্বেগ! দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা! এমন লোকের এমন উদ্বেগ কি দূর হইবে না? এমন লোকের এমন আকাঙ্ক্ষা, ভগবান কি অপূর্ণ রাখিবেন? এই সময়, যদুপতির একখানি পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে, খরচা-খরচা-বাদে, ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি, যদুপতির হাতে দুই হাজার টাকা নগদ জমিয়া গেল। পূজার যে সব খরচ-পত্র আছে, তাহার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। এখন, এই অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা হাতে পাইয়া, যদুপতির আর আনন্দের অবধি রহিল না। যদুপতি অবিলম্বে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট পত্র লিখিলেন; আপাততঃ কমলার জন্য কি কি গহনা গড়ান হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন। যথা-সময়ে পত্রের উত্তর আসিল; বালা, অনন্ত প্রভৃতি মোটা মোটা কয়েকখানা গহনার কথা বিন্ধ্যবাসিনী লিখিয়া পাঠাইলেন। পূজার ছুটির পূর্ব্বে যদুপতির হাতে বিদ্যালয়ের অনেকগুলা কাজের ভার পড়িয়াছিল; সুতরাং বিন্ধ্যবাসিনীর উত্তর পাইয়াই তিনি গহনাগুলি গড়াইতে দিবার অবসর পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—"বিরাট্ কলিকাতা সহরে বিরাট্ কারখানা-সমূহ আছে। এই কয়খানা গহনা বৈ তো নয়! কলিকাতার স্বর্ণকারেরা তিন দিনেই এ সকল গহনা গড়াইয়া দিতে পারিবে।" এই বিষয়ে, তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরামর্শ হইল। তিনিও সেই রায়েই সায় দিলেন। বলা বাহুল্য, বন্ধু সম-ব্যবসায়ী—বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক। বন্ধু কহিলেন,—"অবসর-মত একদিন 'কয়েন্সিতে' গিয়া গিনি কিনিয়া আনিব। তার পর, রবিবার দিন, দাস কোম্পানীর প্রোপ্রাইটারকে ডাকিয়া গহনাগুলি গড়াইবার 'অর্ডার' দেওয়া যাইবে।"

এইভাবেই ভাদ্র মাসটা কাটিয়া গেল। আশ্বিনের প্রথমে যদুপতি কমলার এক পত্র পাইলেন। পত্র পাইয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন,—"কমলা বোধ হয়

দিদির মুখে শুনিয়া গহনার কোনও অদল-বদল করিতে চায়; তাই এই পত্র লিখিয়াছে।" কিন্তু পরক্ষণেই, পত্রখানি পাঠ করিয়া, তাঁহার সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পত্রে কমলা গহনার কথা কিছুই লেখেন নাই। কমলা লিখিয়াছেন,—"এ বৎসর দেশের বড় দুরবস্থা। আশুধান্য আদৌ জন্মে নাই। এখনই নানাস্থানে চুরী-ডাকাতি লুঠতরাজ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোকে এবার অন্নাভাবে মারা যাইবে। নিকটস্থ দশখানা গ্রামের ভিতর, কেহ যে সংবৎসরের খাবার ধানটাও পাইবে, তাহা মনে হয় না। জগদম্বা এবার কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" পত্রে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার এইরূপ আরও নানা কথা লিখিত ছিল। কিন্তু যদুপতি তৎপ্রতি তাদৃশ আস্থা-স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"কমলার কোমল প্রাণ। কমলা অল্পেই বিভীষিকা দেখে।" তিনি আপনা-আপনিই মনকে আশ্বস্ত করিলেন,—"এতটা কখনই নয়।" পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল,—"গহনা গড়াইবার কথা হইলেই কমলা পাঁচটা অভাবের কথা পাড়িয়া বসে। এ যেন কমলার কি এক বিপরীত স্বভাব।" সুতরাং যদুপতি মনকে প্রবোধ দিলেন,—"যতই যাহা হউক, এবার পূজায় কমলাকে নূতন অলঙ্কারে সাজাইবই সাজাইব।"

সেই দিনই যদুপতি, দাস-কোম্পানীর অধ্যক্ষকে ডাকাইয়া আনিলেন। সেই দিনই গহনা-সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা-পরামর্শ হইল। সুবিধা হইলে দুই এক দিন মধ্যেই গিনি কিনিয়া দেওয়া হইবে, এবং গিনি কিনিয়া দেওয়ার পর সপ্তাহ মধ্যে সমস্ত গহনা পাওয়া যাইবে;—কথাবার্ত্তায় এতদূর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া রহিল।

সে দিন, সে রাত্রি, যদুপতির মনে অন্য ভাবনা আর স্থান পাইল না। যদুপতি একবার ভাবিতে লাগিলেন,—"কমলা এমন পত্র কেন লিখিল!" আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"অজয়া-রূপী শয়তান আবার বুঝি আমার শুভ-আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিতে আসিয়াছে!" রাত্রিতে যদুপতির নিদ্রা হইল না। এক একবার

তন্দ্রা আসে, এক একবার যদুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসেন। স্বপ্নঘোরে এক একবার তিনি যেন দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার বাসগ্রাম নন্দনপুর প্রেত-পিশাচে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাঁহার বাড়ীর চারিধারে—কঙ্কালসর্ব্বস্বদেহ, প্রকটগণ্ডাস্থি, শিথিলুলিত-চিবুক, অসংখ্য নরনারী অন্ন দে! অন্ন দে!" বলিয়া ফুকারিয়া মরিতেছে। আবার এক একবার দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার প্রাণাধিকা কমলা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কমলার ন্যায়—অন্নপূর্ণার ন্যায়—অন্নস্থালী হস্তে করিয়া অন্নবিতরণ করিতেছেন;—আর যদুপতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এক একবার কহিতেছেন,—'দেখ দেখ, কেমন অলঙ্কারে আমায় কেমন সুন্দর মানাইয়াছে!' স্বপ্ন দেখিয়া, যদুপতি এক একবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, এক একবার আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এক একবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"কি ভীষণ!" এক একবার মনে হইতে লাগিল,—"মরি মরি!—কি সুন্দর!" তখন, নূতন অলঙ্কারে কমলাকে কি সুন্দর মানায়,—সেই ভাবেই যদুপতি বিভোর হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে বন্ধুবান্ধব সকলে প্রত্যক্ষ করিল,—যদুপতি আর সে যদুপতি নাই; যদুপতির প্রকৃতি প্রভাত হইতে সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইল;—উষার আলোক-রাগের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার হৃদয়ে কি-যেন-কি-এক নবীন আলোক-রাগ উদ্ভাসিত।

সাধ্যের অতীত কোনও কার্য্য করিতে হইলে, মানুষ ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করে। আপন শক্তিতে কুলান না হইলে, মানুষ ভগবানের নিকট শক্তিসামর্থ্য ভিক্ষা করিয়া থাকে। দেশে অন্নকষ্টের—দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দর্শন করিয়া, ব্যাকুলা হইয়া, কমলা যদুপতিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে আর কুলাইল না; তিনি তখন তাহার পতি-দেবতার নিকট সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কমলা কিশোর-বয়সে পিতামাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন,—"পতিই স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা, পতিই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পতি ভিন্ন নারীজাতির অন্যগতি দ্বিতীয় নাই।" কমলার পিতামাতা তাঁহাকে আরও শিখাইয়াছিলেন,—

"প্রত্যক্ষ দেবতা পতি বিদ্যমানে, সাধ্বী সতীর ভাবনা কি? নারীর মনো-বেদনা, অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করিবার কোনও আবশ্যক নাই; সে কেবল তাহার প্রত্যক্ষ পতি-দেবতার নিকট আপন অভাব-অভিযোগ জানাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে।" আবাল্য কমলার প্রাণে সেই শিক্ষাই বদ্ধমূল আছে। কমলার পিতামহ দেশপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি কমলাকে পার্শ্বে বসাইয়া নারীধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রোক্ত বচনসমূহ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া গিয়াছেন। কমলা এখনও সে সকল শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিতে পারে। কমলা এখনও কথায় কথায় স্মরণ করিয়া থাকে,—

"পতির্বন্ধু পতির্গুরু পতির্হি দেবতা নারীনাং।"

অর্থাৎ,—"পতিই বন্ধু পতিই গুরু, পতিই নারীদিগের দেবতা। পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই।" আর, সেই বিশ্বাসের বলেই, কখনও কোনও গুরুতর ভাবনায় পড়িলে, কমলা তাহা পতিকে জানাইয়াই নিশ্চিন্ত হয়। দেশে ভাবী বিপৎপাতের লক্ষণ অনুভব করিয়া, কমলা তাই যদু-পতিকে জানাইয়াই নিশ্চিন্ত আছে। কমলা জানে,—"কমলা-পতিই সাক্ষাৎ কমলাপতি! আর্ত্তের পরিত্রাণে, নিরন্নে অন্নদানে, তিনি কি কখনও উদাসীন থাকিতে পারেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কি আনন্দ! স্বদেশ-প্রত্যাগমনে কি আন ! যার স্বদেশ আছে, তার কি আনন্দ!

পূজার সময় বাড়ী যাওয়ায় বাঙ্গালীর যে আনন্দ, বুঝি তেমন আনন্দ কোনও জাতির কখনও হয় না! সংবৎসরের পর, পিতামাতার শ্রীচরণ দর্শন করিব,—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের চরণধূলি মস্তকে লইব; স্নেহের আধার পুত্র-

কন্যার মুখ দেখিব,—তাহাদের অস্ফুট আধ-আধ সুধামাখা-স্বরে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব;—প্রাণে কত আশা—কত পিপাসা! প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় পথ-পানে চাহিয়া আছে,—দিন দিন দিন-গণনা করিয়া কত কষ্টেই দিনযাপন করিতেছে;—কতদিন পরে আবার তাহাকে দেখিব, কতদিন পরে আবার তাহার সুখসঙ্গ লাভ করিব,—এ আনন্দের অবধি আছে কি?

পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইবার জন্য যদুপতি দেশে রওনা হইয়াছেন। বাসার বালকেরা, ছুটী পাইয়া, সকলেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাসায় চাবি বন্ধ করিয়া, একজন দ্বারবানের উপর বাসার ভার দিয়া, যদুপতি দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্মুখে শরতের স্বচ্ছ আকাশে তৃতীয়ার চন্দ্রে কেমন হাসি রেখাটুকু বিকাশ পাইয়াছে! গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপর দাঁড়াইয়া যদুপতি তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন; আর মনে মনে ভাবিতেছেন,—"কাল প্রভাতে নতন অলঙ্কারে কমলার মুখেও ঐ হাসির বিকাশ দেখিব!"

চাঁদের আলো উজ্জ্বল থাকিতে থাকিতে, রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই, যদুপতির নৌকা পলাশপুলির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে নন্দনপুর ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পাল্কী বা গোযান ব্যতীত সে গ্রামে পৌঁছিবার উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া ছিল। যদুপতির বাড়ী হইতে তাঁহার গোমস্তা ও চাকর-বাকর আসিয়া, পাল্কী লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এবার তিনি গোমস্তাকে ঘাটে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই তাঁহাকে কহিলেন,—"আপনাকে আসিতে বলার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পশ্চাতে আরও দুইখানা নৌকা আসিতেছে। সেই নৌকায় অনেক জিনিসপত্র আছে। সেই সব নামাইয়া, গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়া, বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। আজ রাত্রে সকলেই এইখানে অবস্থান

করা যাউক। কাল প্রাতে জিনিস-পত্র রওনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি অগ্রসর হইব। আপনি পশ্চাতে সকলকে গুছাইয়া লইয়া যাইবেন।” পলাশপুলি প্রসিদ্ধ বন্দর। গরুর গাড়ী সর্ব্বদাই সে বন্দরে পাওয়া যায়। সুতরাং পরামর্শ অনুসারে সেই রাত্রেই কুড়ি পঁচিশ খানা গরুর গাড়ীর বায়না হইয়া রহিল। যদুপতি গোমস্তাকে আরও বলিয়া দিলেন—“বন্দর হইতে প্রাতে কতকগুলা হাঁড়ি, সরা, মালসা ও হাতা বেড়ী কিনিয়া লইবেন।”

* * * * *

মধ্যাহ্নে যদুপতি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ীতে আনন্দ উথলিয়া তিনি পালকী হইতে নামিতেই, তাঁহার শিশু পুত্রটি “বাবা” বলিয়া কোলে উঠিয়া বসিল; জ্যেষ্ঠ পুত্র মণিমোহন, পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীগণও চারিদিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। পথে—গ্রামের কত লোক, তাঁহাকে দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্ব্বিশেষে, তাহারা কেহ বা প্রণাম করিল, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। অতঃপর, যদুপতি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দিদির চরণে প্রণত হইলেন। কমলা ও কনিষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

যদুপতির আহারের সময়, কথায় কথায়, বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কৈ, বৌয়ের কি গয়না এনেছিস্, দেখালিনে তো! কমলার জন্যে আমি যে যে গহনার কথা লিখে দিয়েছিলাম, তার সবগুলা বুঝি আনতে পারিস-নি!”

যদুপতি, মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া, ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—“না দিদি! কমলা পত্র লিখে সব উল্টে দিয়েছে। গহনার অদল-বদল হয়ে গিয়েছে।”

বিন্ধ্যবাসিনী ভাবিলেন,—“বোধ হয় কমলা নূতন কিছু গহনার ফরমাস করেছিল। তাই আমার পছন্দমত সব গহনাগুলি গড়ান হয় নাই।” তা না হউক, তাহাতে বিন্ধ্যবাসিনী কিন্তু অণুমাত্র ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলেন না। কমলার প্রতি তাঁহার ঈর্ষা-দ্বেষ তো একটুও নাই! কমলা যাহাতে সুখী হয়,

কমলার যাহা পছন্দ-সই হয়,—তাঁহারও তো তাহাই ইচ্ছা। বিন্ধ্যবাসিনী ই উত্তর দিলেন,—"গহনার অদল-বদল যাই হ'ক, কমলার পছন্দ হ'লেই 'লো।"

যদুপতি আহ্লাদ প্রকাশে কহিলেন,—'তবে দিদি! নিশ্চিন্ত হউন। মলা যাহা ভালবাসে, এবার সেই গহনাই আনিয়াছি। খানিক পরেই দেখিতে াইবেন,—সে গহনায় গৃহসংসার কত উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।"

কমলাও পার্শ্বে বসিয়া ছিল! কমলা মনে মনে যদুপতিকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। যদুপতি তখন একে একে ভগিনীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন,—কি প্রকারে তাঁহার দুই হাজার টাকা জমিয়াছিল। বলিলেন,—সেই টাকায় গহনা গড়াইবার জন্য তিনি কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন! বলিলেন,—কমলার পত্র পাইয়াই কিরূপভাবে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হয়। বলিলেন,—সেই টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কত মণ চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। বলিলেন,—ঐ চাউলগুলি উপলক্ষ করি। অন্নকষ্টের সময় বাড়ীতে কেমন একটী অন্নসত্র বসিবেন। শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, বল দেখি দিদি! সেই অন্নসত্রে কমলা যখন হাতা-বেড়ী হাতে করিয়া অন্ন বিতরণ করিবে, তখন সে অলঙ্কারে তাহার কেমন শোভা বাড়িবে? স্ত্রীলোকের সুবর্ণ-অলঙ্কার শ্রেষ্ঠভূষণ, কি হাতা-বেড়ী লইয়া অন্নবিতরণ শ্রেষ্ঠভূষণ,—দিদি,—এ বয়সে এখনও আমি তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তাই, সোনার অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে, কমলার জন্য আমি এই অভিনব অলঙ্কার আনয়ন করিয়াছি।"

* * *

মহাসপ্তমীর মহোৎসবের দিন, কমলা সেই নূতন অলঙ্কার পরিধান করিয়াছেন। মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, নন্দনপুরে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। কমলার আজ কি আনন্দ! তাঁহার মনে হইতেছে,—বুঝি শত সুবর্ণ

অলঙ্কারেও তাঁহার তেমন শোভা খুলিত না। যেখানে বসুপতি আছেন, যেখানে কমলা বিগ্রাজমানা,—সেখানে শোভার অভাব কি আছে? শত অজন্মা হইলেও, সেখানে অন্নকষ্ট দুর্ভিক্ষ কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না;—সেখানে শোভার অভাব কি প্রকারে হইবে? যাঁহাদের বসুপতি আছেন, যাঁহাদের কমলা আছেন, তাঁহারা সেই শোভা সর্ব্বদা দেখুন; দেখুন—বসুপতি কেমনভাবে অন্ন-সরবরাহ করিতেছেন! দেখুন,—কমলা কেমনভাবে অন্ন-বিতরণে ব্রতী আছেন! দেখুন,—বসুপতির সার্থক উপার্জ্জন। দেখুন,—কমলার সার্থক অলঙ্কার-গ্রহণ!

সম্পূর্ণ।

কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেল-পার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২ টার হিসাবে) এ সালসা লইতে-ছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লই-লেও, কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাক-মাশুল ৮৲ আট টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲ ২৲ বা ৩৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেল-পার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেল-ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন; ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃমাঃ ৬৲ ছয় টাকা।

১ নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাঃমাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ চারিদিন সেবনীয়; ২নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ আট দিন সেবনীয়। ৩নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ বার দিন সেবনীয়। চারি দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

সালসা পাইবার ঠিকানা,—৭১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।